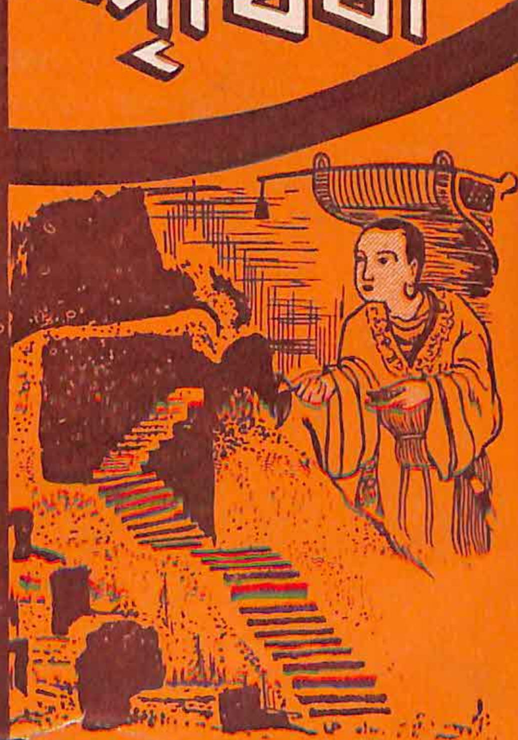




মধ্য যুগের পৃথিবী







Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of History for Class VII of Madhyamic Schools & Madrasahs.
Vide T. B. No VII/H/81/94 Dt. 8. 1. 81.

মধ্যযুগের পৃথিবী

(মধ্যযুগের সভ্যতার ইতিহাস)

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীবামাচরণ চক্রবর্তী এম, এ (ডবল) বি, টি
প্রধান শিক্ষক : সাউথ ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল হাইস্কুল, কলিকাতা

ও

এস, এম, আখতার হোসেন এম, এ
প্রাক্তন শিক্ষক : শিক্ষাসত্ম, (ইউনিয়ন ক্রিশ্চান মিশনারী বহুমুখী বিদ্যালয়)—বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগণা।

বাণী প্রকাশ
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
এ-১২৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম সংস্করণ : ১৯৮০
বোর্ডের বিশেষজ্ঞ নির্দেশিত সংশোধিত সংস্করণ—১৯৮০
তৃতীয় সংস্করণ—১৯৮১
চতুর্থ সংস্করণ—১৯৮১
পঞ্চম সংস্করণ—১৯৮৩

প্রকাশিকা :
কানিজ মুস্তাফা
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
শ্রীপ্রদ্যুৎকুমার মান্না
বিশ্বকর্মা প্রেস
২/১এ, আশুতোষ শীল লেন
কলকাতা-৬

মূল্য : আট টাকা ষাট পয়সা

সূচীপত্র

6. **Western Europe in Medieval Period (800-1200 A.D. approx.) :**

(a) Charlemagne—revival of the Holy Roman Empire (800 A.D.). Importance of Coronation—relation between State and Church,—Court and its patronage on art and literature. (b) Monasteries—monks and nuns—life centring round monasteries (Bene: dictive vows) the role of monasteries in the preservation and dissemination of learning—Cluny (Freeing the Church from corruption, secularisation and feudalisation). (c) Invostiture issue (Reference only). (d) 11th and 12th centuries : from monastic and catihedral schools, Universities—some famous scholars, students and teacher relationship. The growth of studies in Law, Medicine, Theology, as well as logic, liberal arts, literature.

7. **Feudalism in Medieval Europe :**

(a) Fudalism : Land—the bond between man and man ; The Feudal hierarchy ; private assumption of public authority, the role of the Feudal Castle and mailed horesemen in saving Europe ; Feudalism—a way of life ; Institution of Chivalry-Troubadours. (b) Manorial System : Manorialism—economic aspects of Feudalism ; Manor—the local unit of Feudal Govt, Manorial Court. Economic conditions : Cultivation by labour of village community ; peasants' heavy toil and heavy rent—conditions of peasants' life. Heavy dues to lord and Church in cash or kind. Manorial life in Castles—Three distinct classes—clergy, nobility and the rest—nobility and peasants at opposite poles. Serf—a chattel of the Lord—obligatory service, hereditary serfdom ; Means of escape—joining a holy order, running away to town for shelter, getting employed in business and industry, Revolt.

8. **The Crusades : (1st, 3rd, 4th)**

Motives—Impact upon society and culture—new towns and trade-centres (Italy in particular), cottage industries separated from agriculture (11th & 12th centuries).

9. **Growth of Towns :**

Role of the Crusades—Guilds in towns—their activities—a

short account of life in towns. Town autonomy by royal charter ; origin of the term Bourgecis.

10. The Far East in the Middle Ages :

(i) China in Medieval Period (from early 7th century to 14th Century).

(a) The Tang period (614—907 A.D.) Re-unification of China and recasting the laws : Education, Learning, literature (poetry) : Tea, printing arts. Promotion of trade, commerce and agriculture, Buddhism in China. Chinese civilisation apread to Japan, Korea, Annam. China—a model for emulation. Hiuen Tsang's visit to India and his return—impact. (b) The Sung period (960—1280)—Important experiments—State control of Commerce, State loan to farmers, property Tax, Education and Culture. (c) The Yuan period (1280—1368) : The Mongols : Kublai Khan (Tibetan Buddhism), and the account of Marcopolo.

(ii) Japan in Medieval period :

(a) Society and Feudal economy in early medieval times, Supremacy of Mikado : Close links with China. Resistance of "Great Families". Mikado combined the office of Shinto High priest and absolute sovereign. Yet the growing power of hereditary clan-families and enrichment of Buddhist Orders weakened the central authority. The Shogunate. The Samurai, Japanese Chivalry (Bushido).

11. India in the Middle Ages :

(a) After the Guptas (5th—7th century). Hun incursions from 458 (occupation of Persia, Kabul, North Western India historical importance of the Huns.) Break up of the Gupta Empire ; Age of Harshavardhan ; Shrinking of the ideal of imperial unity to only Uttarpathanath : Hiuen Tsang's travel—his account ; Nalanda—main features of the University. (b) Post-Harshavardhan period (8th to 12t century). After Harshavardhan—rise of smaller States. The 'Rajputs' : The Feudal Clannish principalities of Rajputana : Pala, Partihara, Rastrakuta contest (reference only)—inability to establish a united empire ; smaller

kingdoms and vassals. (c) Bengal : Sasanka, Life and Society under the Palas and Senas—Religion and learning (Vikrrmsila and Uddandapur). (d) South India—The Chalukyays of Badami and Pallavas of Kanchi,—thair contributions to Art and Architecture —Maritime activities of the Cholas.

12. **India's foreign contacts :**

By land—Mahayana Budhism in Central Asia, thence to China (Khotan muins, Hiuen Tsang's evidence) : Tibet—(Atisa Dipankar), by Sea—Setitlements and cultural influence in South East Asia. Subarnabhumi—Yashodharpur and Ankkorvat, Angkorthom—Malay, Java—Barobudar.

13. **The Sultans of Delhi (1206 to 1526 A.D.)**

Coming of Turko—Afghans to India (only a brief reference to the motive and manner of their coming) ; Main features of political, Social and economic life ; Mutual influence of Hinduism and Islam ; liberal developments in Artf and Culture, translation of classics, Bhakti Cult (the medieval Saints)—Sri Chaintanya, Nanak and Kabir. Bengal—Social, cultural and economic conditions in Ilias Shah and Hussain Shah's periods. Short account of the general administrative system.

14. **Towards the end of the Medieval era (14th & 15th centuries).**

Fall of constantinople : its impact on the Renaissance which had already started in the West. *Features of the Renaissance era—Spirit of enquiry and reasoning, widening of frontiers of knowledge, scientific discoveries based on "obsecured facts", geographical discoveries—its outcome. *National States—France, England, Portugal, Spain, Struggle for National Freedom (Dutch). *Expansion of Europe. *Old Order Vs. New Order—The English revolt. Topics with asterisks should only be used as reference, as a conclusion to the old era and introduction of a new era.

মধ্য যুগের পৃথিবী

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইতিহাসে মধ্যযুগ

মধ্যযুগের সময়সীমা ঃ মানুষের সভ্যতা অবিরত ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যুগ যুগান্তরব্যাপী মানবসভ্যতার সেই ভাঙাগড়ার কাহিনী, মানুষের কীর্তি, অগ্রগতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জয়পরাজয়ের কাহিনীকে ধরে রেখেছে ইতিহাস। মানব ইতিহাসের এই সীমানা বিশাল ও ব্যাপক। ঐতিহাসিকগণ সেই দীর্ঘকাহিনী ইতিহাস আকারে লিখেছেন।

বিশ্বমানবসভ্যতাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। আদি মানব থেকে শেষ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ হল **প্রাচীন যুগ**। প্রাচীন যুগের অবসান, ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ও রোমের টুকরো হয়ে যাওয়ার ইতিহাস থেকে শুরু করে প্রায় হাজার বছর সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া পৃথিবীর ঘটনাকাল হল **মধ্যযুগ**। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় মধ্যযুগের আরম্ভ এবং অবসান হয়।

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর ইউরোপের অবস্থা ঃ ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্বর জার্মান জাতির আক্রমণে ইউরোপে প্রাচীন সভ্যতার অবসান হয়ে মধ্যযুগের শুরু হয়। এই যুগের শুরুতে রোমে চরম অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে ফ্র্যাঙ্ক, গথ, ভ্যাণ্ডাল, লাম্বার্ড, আলমান, বার্গাণ্ডিয়ান, জুট, স্যাক্সন, এঙ্গেলস প্রভৃতি বর্বর জার্মান উপজাতিগণ রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এই সকল শক্তিশালী জাতির আক্রমণ থেকে এই যুগের শুরু। এই সব জাতির বেশীর ভাগই ছিল সামন্ততান্ত্রিক। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও এই রণদুর্ধর্ষ জার্মান জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সমগ্র ইউরোপে প্রচণ্ড অরাজকতা নেমে আসে।

সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়। পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসেও এই সময় নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার। গথগণ স্পেনে, ফ্র্যাঙ্কগণ ফ্রান্স ও জার্মানীতে আধিপত্য বিস্তার করে। মধ্যযুগে জার্মানদের উপর হূণ আক্রমণ ঘটে। হূণদের অত্যাচার এই যুগে ছিল অভিশাপের মত।

পূর্ব রোমের অবস্থা ঃ সম্রাট কন্‌স্টানটাইনের নেতৃত্বে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য তখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। লিবিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনরের সমৃদ্ধশালী স্থানগুলি ও বলকান প্রদেশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। কনস্টানটাইনের নামানুসারে এর রাজধানীর নাম হয় কনস্টান্টিনোপল। ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ বাইজানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান রাজদণ্ড হাতে নেন। তিনি ভ্যাণ্ডালদের কাছে থেকে আফ্রিকা, গথদের কাছ থেকে ইটালি ও স্পেন দখল করে নেন।

জীবনধারার বৈশিষ্ট্য ঃ মধ্যযুগে প্রাসাদের জাঁকজমক, সাজসজ্জা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন শুরু হয়। ইটালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নবাগত জাতিগুলির বেশীর ভাগ একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে এক নতুন মিশ্র জাতির উদ্ভব হয়। রোমানদের প্রভাবে এরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

মধ্যযুগের শুরুতেই ফ্রাঙ্করা সম্রাট শার্লেমেনের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। শার্লেমেনের আমলে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে।

মধ্যযুগের ইউরোপে পুরোহিতদের স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের থাকার জন্য বিরাট বিরাট মঠ গড়ে উঠেছিল। এই যুগে পোপ, যাজক ও সন্ন্যাসীদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মঠের বিদ্যালয়ে সন্ন্যাসীগণ ছাত্রদের ল্যাটিন ভাষা ও অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষা দিতেন।

মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পত্তন হয়। এই সমাজের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল রাজার। সামন্তসমাজে তিনটি শ্রেণী ছিল—যাজকশ্রেণী, শাসক শ্রেণী ও ভূমিদাস শ্রেণী। সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত গ্রামগুলিকে বলা হতো **ম্যানর**। ম্যানরকে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগের সমাজ-জীবন গড়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। ইউরোপে নানা দেশ থেকে ছাত্রসম্প্রদায় বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে পড়তে আসত। ফ্রান্সের প্যারিস, ইটালির বোলোনা ও সেলের্নো, জার্মানির হাইডেলবার্গ, ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল।

মধ্যযুগের অপর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। মুসলমানদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের সংঘর্ষকেই বলা হয় ক্রুসেড। প্রায় দুশ বৎসর এই সংঘর্ষ চলে। মধ্যযুগেই আরব দেশের মক্কা নগরীতে হজরত মোহাম্মদ নামীয় এক মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁর প্রচারিত ধর্মের প্রভাবে গোটা মধ্য এশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন ও সামাজিক উন্নতি বিশ্বইতিহাসকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করে। শীঘ্রই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত আরববাসীরা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বিরাট অঞ্চলে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করেন।

ভারতের অবস্থা ঃ বর্বরদের আক্রমণে যখন ইউরোপের রোম সাম্রাজ্যের এক একটি স্তম্ভ ক্রমে ক্রমে ধ্বসে পড়ছিল, তখন ভারতে গুপ্তদের অধীনে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল সাম্রাজ্য। কিন্তু রোম সাম্রাজের মত গুপ্ত সাম্রাজ্যেও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর শেষে বা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে হূণজাতির অপর শাখা (সাদা হূণ) পশ্চিম ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে।

গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনের প্রায় একশত বছর পর উত্তর ভারতে অনেক ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, সভ্যতা, ধর্ম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ এই যুগে প্রতিবেশী চীন, মিশর ব্যাবিলন, আরব, রোম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

মধ্যযুগেই মুসলমানরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে অধিকার করে নেয়। পশ্চিম উপকূলের সিন্ধুদেশে আরব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রায় তিনশত বছর পর সুলতান মাহমুদ ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলকে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এই সময় থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ সুলতানী শাসনাধীনে থাকে। পরবর্তীকালে মোগলরাও ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

মধ্যযুগে চীন সম্রাট তাই সুঙ তাতারদের তাড়িয়ে সমগ্র চীনে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর ইতিহাসে মোঙ্গল নামে এক দুর্দ্ধর্ষ জাতির আবির্ভাব ঘটে। মোঙ্গল জাতি চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ সাগর থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এই সময় জাপানেও সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল।

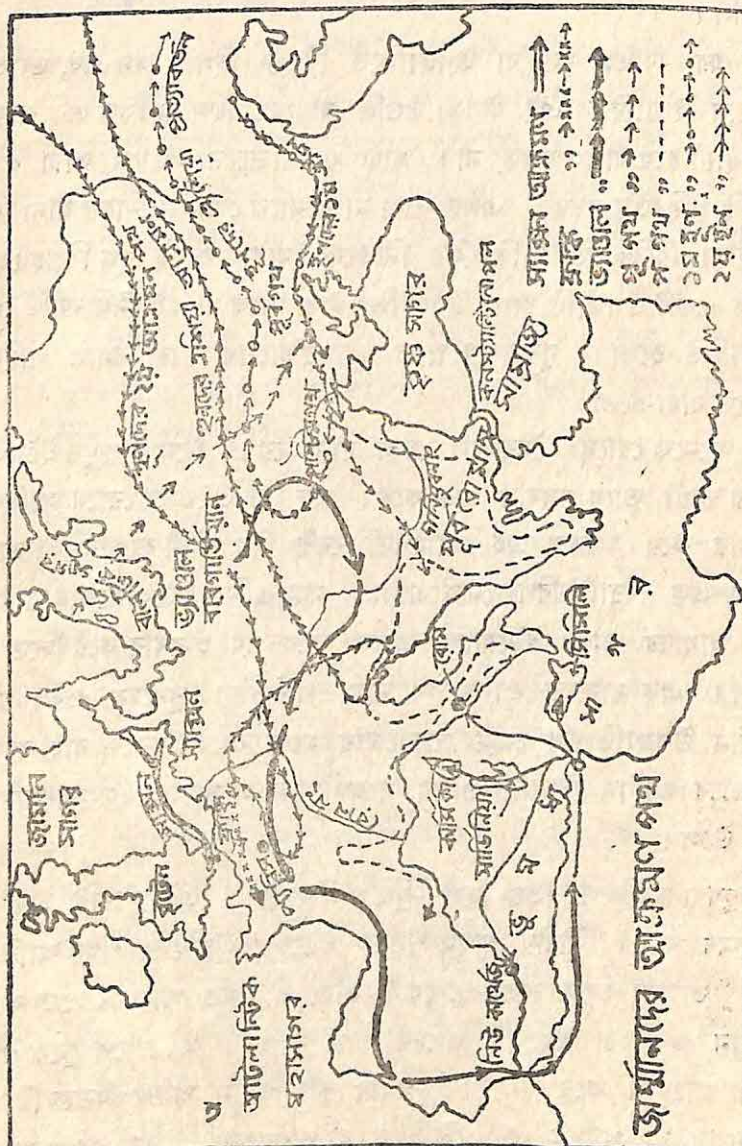
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য

সূচনা : গ্রীস ও রোমে প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটেছিল। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্বর জার্মান জাতির আক্রমণে প্রাচীন রোম সভ্যতার অবসান হয়। প্রাচীন রোম সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা হয়।

হূণদের আক্রমণ এবং জার্মানদের উপর চাপ সৃষ্টি ও রোম সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত ভাঙ্গন : তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধ থেকে রোমের পূর্ব গৌরব স্তিমিত হতে থাকে। এই বিশাল সাম্রজ্যের শাসন ব্যবস্থা প্রায় আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। শাসকগণ হয়ে ওঠেন দুর্বল অথচ অত্যাচারী। অভিজাত সম্প্রাদায় তাঁদের দেশপ্রেমের পুরোনো ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। করের বোঝা তিন চতুর্থাংশ মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। ক্রীতদাস ও ভূমিহীন শ্রমিকদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। শাসন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। খাদ্যের অভাবে জনসংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছিল। সেই কারণে বিদেশীদের স্থায়ী ভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হতো। এইসব বিদেশীরা বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করেছিল। সৈন্য বাহিনীতেও বিরাট সংখ্যায় বিদেশী সেনা ছিল। যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণের অভাবে সৈন্যবাহিনীতে বিশৃঙ্গলা দেখা দেয়। এই বিশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী বিদেশী আক্রমণে বাধাতো দিতই না বরং তাদের স্বাগত

জানাত। প্রতিবেশী গোষ্ঠী ও উপজাতিগুলি এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে রোম আক্রমণ করে। এইসব উপজাতিরা বেশীর ভাগই ছিল জার্মান।



হূণদের আক্রমণে রোমের ভাঙ্গন চূড়ান্ত হলো। বিশাল রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে কতকগুলি টুকরো টুকরো রাজ্যে পরিণত হলো। হূনদের নির্মম

অত্যাচারে সেগুলি বিধ্বস্ত হতে থাকল। এই সময় জার্মান উপজাতিগুলি রোমানদের সঙ্গে মিলে গিয়ে হূণদের আক্রমণ ঠেকাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

এরা বিভিন্ন দল বা উপজাতিতে বিভক্ত ছিল যেমন গথ, ভ্যাণ্ডাল, স্যাক্সন ইত্যাদি। এই উপজাতিগুলি যাযাবর ছিল না কিন্তু এক জায়গায় চিরস্থায়ী হয়ে বাসও করত না। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে তারা প্রায়ই বসতি পরিবর্তন করত। এজন্য তারা মাঝে মাঝে রোম সীমান্তে হানা দিত। তাছাড়া বিভিন্ন উপজাতিগুলির নিজেদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ চলত। ফলে একটি উপজাতি অপর উপজাতির দ্বারা মাঝে মাঝেই নিজ বসতি থেকে বিতাড়িত হতো। পূর্বদেশীয় স্লাভ জাতির চাপেও তারা বসতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হতো।

অনেকে রোমের সৈন্যদলে যোগ দান করে। অনেকে সুদূর ইটালিতে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে। বহু বর্বর এইভাবে রোমে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু এই আধিপত্য বেশী দিন স্থায়ী হলোনা। তাদের উপর এক বিরাট বিপদ নেমে এলো। মধ্য এশিয়া থেকে মঙ্গোলীয় নামে এক যাযাবর জাতি ইউরোপে প্রবেশ করে সব ছারখার করে দিতে শুরু করল। এক যাযাবর জাতি হূণ নামে পরিচিত। হূণদের প্রবল চাপে জার্মান উপজাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হলো। এইভাবে জার্মান উপজাতিগুলির সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

হূণরা দুটি দলে বিভক্ত ছিল—হূণ ও সাদা হূণ। এই হূণরাই ইউরোপ আক্রমণ করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ইউরোপে হূণদের প্রথম আবির্ভাব হয়। তারপর চতুর্থ শতক থেকেই তারা রীতিমত আক্রমণ শুরু করে। রোমান ও গথরা সকলেই তাদের ভয়ে কাঁপত। ইউরোপে ঢুকে প্রথম তারা আক্রমণ করে গথদের। গথরা দুই প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল—অস্ট্রোগথ বা পূর্বপথ এবং ভিসিগথ বা পশ্চিমগথ। অস্ট্রোগথরা হূণদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে প্রায় নিশ্চিহ্ন হলো। তাদের কিছু সংখ্যক হূণদের বশ্যতা স্বীকার করে। ভিসিগথরা তাড়া খেয়ে রোম

সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে ও রোমানদের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ভিসি-গথদের সঙ্গে সংঘর্ষেই শেষ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও রোমান সভ্যতা একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়নি। যে সকল জার্মান উপজাতি আগেই রোমে এসেছিল তারা খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এরাই রোমান আইনকানুন ও সভ্যতা সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে বিশপ ও পুরোহিতদের সাহায্য করেছিল। বিশেষ করে পূর্ব রোমের কনাস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে নূতনভাবে রোম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। রোমানদের উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি ও উচ্চতর জীবনধারা সেখানে বজায় ছিল। রোমের আইনকানুন এখানে বিধিবদ্ধ আকারে সংকলিত হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপে যে ঐক্যের অভাব ছিল —আক্রমণকারীদের মধ্যে সেই জাতিগত ঐক্য ছিল। ফলে জাতিগত ঐক্য বিশিষ্ট রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল।

বর্বরদের দলপতিগণ ঃ

এলারিক ঃ—এলারিক হলেন বিদ্রোহী ভিসিগথদের তরুণ নেতা। ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—পূর্বাংশ হলো বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। সেখানকার রাজধানী ছিল বাইজানটিয়াম, বর্তমান কনস্টান্টিনোপল আর পশ্চিমাংশ হলো রোম। ভিসিগথরা রোমান রাজ-কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহ করে। সম্রাট ভালেন্স বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পশ্চিম গথদের শান্ত করা গেল। তাঁদের তরুণ নেতা এলারিক সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের বশ্যতা স্বীকার করেন। থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য দুভাগে বিভক্ত হয়। সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতা ভিসিগথরা গ্রহণ করল। গথ-নেতা এলারিক শক্তি সংগ্রহ করে রোম আক্রমণ করেন। রোমানরা সন্ধি প্রস্তাব করল। সন্ধির বিনিময়ে এলারিক রোমের সমস্ত ধনরত্ন চাইলেন। ঘোর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রোম সম্রাটকে এলারিকের দাবি মেনে নিতে হলো। সেবারকার মত এলারিক ফিরে যান।

কিছুদিনের মধ্যে সম্রাটের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে এলারিক আবার রোম আক্রমণ করেন। রোমের ক্রীতদাসরা এলারিককে রাজধানীর দরজা খুলে

দিল। তিন দিন তিন রাত ধরে গথরা রোম লুণ্ঠন করল। শহরের মূল্যবান সমস্ত দ্রব্য বোঝাই করে আবার এলারিক ফিরে যান। এই বার রোমের সম্পূর্ণ পতন ঘটে। রোমের পতনের পরই এলারিকের মৃত্যু হয়।

হূণনেতা এ্যাটিলা ঃ—রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময় হূণরা এ্যাটিলার নেতৃত্বে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান বিধ্বস্ত করে সোজা গ্রীস দেশে প্রবেশ



হূণনেতা অ্যাটিলা

করে। এই দারুণ বিপদের সময় রোম বীর ঈটিয়াস ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। পরের বছর আবার এ্যাটিলা ইটালি আক্রমণ

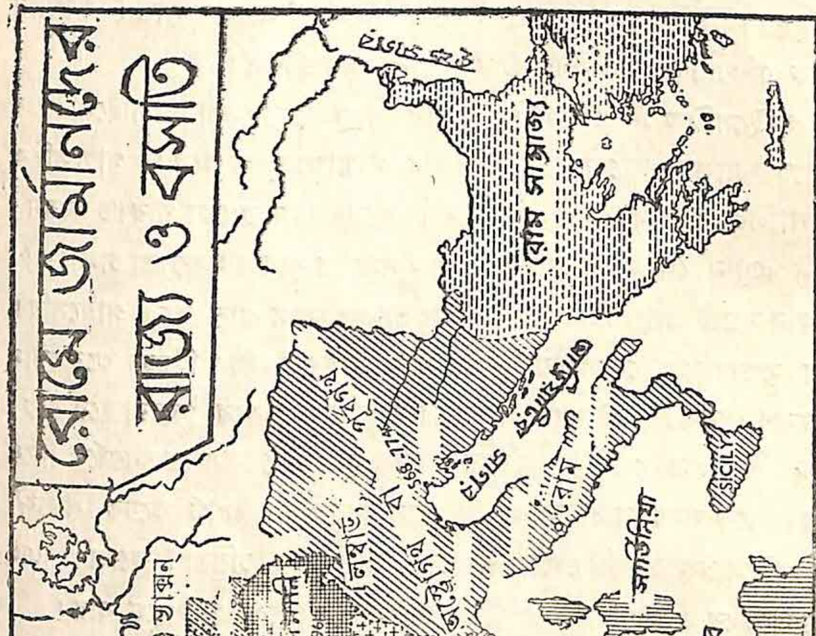
করতে আসেন। সমগ্র ইটালি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। শেষে রোমের পোপের নির্দেশে এ্যাটিলা প্রত্যাবর্তন করেন। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাটিলার মৃত্যু হয়। ইতিহাসে এ্যাটিলা 'ঈশ্বরের অভিশাপ' নামে কুখ্যাত। জার্মানি থেকে এশিয়ার সীমানা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

গাইসেরিক ঃ—গাইসেরিক ছিলেন ভ্যাণ্ডালদের নেতা। গাইসেরিকের নেতৃত্বে ভ্যাণ্ডালরা রোমের আফ্রিকান সাম্রাজ্য দখল করে। গাইসেরিক ত্রিপোলির পশ্চিমের সব প্রদেশ দখল করে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি এখান থেকে উত্তর ও পূর্ব দিকে সমুদ্রের বুকে জলদস্যুতা চালাতেন। রোমান সম্রাট ভ্যালেন্টিনিয়ানের আত্মহত্যার সুযোগ গ্রহণ করে গাইসেরিক তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের জড়ো করে টাইবার নদী অতিক্রম করে রোম আক্রমণ করেন। এই সময় পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়। চৌদ্দ দিন ধরে রোম লুণ্ঠন করে অসংখ্য মূর্তি ও তৈজসপত্র কার্থেজে নিয়ে যান। এক সময় রোমানরা কার্থেজ ধ্বংস করেছিল। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর গাইসেরিক কার্থেজ থেকে এসে সেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন। এই আক্রমণে রোম ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে প্রায় মুছে যায়।

অভিযানকারীদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনধারা ঃ জার্মানদের সমাজ ছিল চার শ্রেণীতে বিভক্ত ; সম্ভ্রান্ত, স্বাধীন জনসাধারণ, ভূমিদাস ও ক্রীতদাস। এরা বিভিন্ন দল বা উপজাতিতে বিভক্ত ছিল ; যেমন গথ, ভ্যাণ্ডাল, ফ্র্যাঙ্ক, স্যাক্সন, এঙ্গেলস্, লাম্বার্ড, বার্গাণ্ডীয় ইত্যাদি। কতকগুলি পরিবার মিলে একটি মার্ক বা ডক বা গ্রাম গড়ে উঠত। প্রত্যেক গ্রামের স্বাধীন জনসাধারণকে নিয়ে একটি সমিতি ছিল তার নাম 'মুট'। কতকগুলো 'মুট' নিয়ে গঠিত হতো একটি হাণ্ড্রেড। কতকগুলো হাণ্ড্রেডের সমষ্টিকে বলা হতো 'গ'। 'গ' নিয়ে তৈরী হতো একটি গোটা উপজাতির বাসভূমি। প্রথমে তাদের কোন রাজা ছিলনা। এক একটি উপজাতির নেতৃত্ব করবার জন্য তারা দলের যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচন করত। নেতাদের প্রতি তারা খুব বিশ্বস্ত ছিল।

এক জায়গায় চিরস্থায়ী হয়ে বাসও করত না। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে মাঝে মাঝে বসতি পরিবর্তন করত। পরে তারা যাযাবর জীবন ছেড়ে

সমাজবদ্ধ হয়ে নগরে বসবাস শুরু করে। রাজা নির্বাচন করে তাঁর অধীনে বসবাস করায় অভ্যস্ত হয়। শিকার ও পশুপালন ছেড়ে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ



করে। এইভাবে তারা সর্বোচ্চ শাসক হিসাবে সম্রাটকে মেনে নিয়ে রাজনৈতিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়।

গথ, ফ্রাঙ্ক, লাম্বার্ড প্রভৃতি উপজাতিদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। দীর্ঘকাল ধরে এই সংঘর্ষের ফলে রোমে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না। অত্যাচার, বিশৃঙ্খলা, দুঃখ দারিদ্র্যে দেশ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অবশেষে আক্রমণকারীরা বিজিত দেশের সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের অধিকাংশ খ্রীষ্ট ধর্ম ও খ্রীষ্টীয় চার্চের সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং বিজিত দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। গথগণ স্পেনে, ফ্রাঙ্কগণ ফ্রান্সে এবং লাম্বার্ডরা ইটালির অধিবাসীতে পরিণত হয়। তারা রোম সভ্যতাকে গ্রহণ করে তাকে আরও সমৃদ্ধতর করে তোলে। পুরানো রোম সভ্যতা এবং জার্মানদের জীবনধারার মিলিত ফল হিসেবে জন্ম নেয় পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের এক নূতন সমাজজীবন।

জার্মানদের রোমে বসতি ও মিশ্র রোমান জাতি : বর্বর জাতিগুলি রোমে এসেছিল অভিযানকারী হিসেবে। সুসভ্য রোমানরা তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখত বলে বলত বর্বর। এই জাতিগুলি রোমের বিভিন্ন প্রদেশে বসতি স্থাপন করে। শীঘ্রই তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়—বহু জাতির মিশ্রণে এক নূতন জাতি গড়ে ওঠে। নূতন নূতন ভাষা জন্ম নেয়। যেমন এ্যাঙ্গলো, স্যাক্সনদের ভাষার সঙ্গে নরমানদের ভাষা ও ফরাসী ভাষা মিশে জন্ম হলো ইংরেজি ভাষার।

নবম শতকে গথদের একটি শাখা রাশিয়ায় অভিযান চালায়। আবার নর্মনদের রুশ নামে উপজাতি পূর্ব রাশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে। এদের মিলনেই রুশ জাতির উৎপত্তি হয়। পরে এরা স্লাভদের সঙ্গে মিলে বিশাল স্লাভ সংস্কৃতির জন্ম দেয়। মোঙ্গলরা স্লাভদের সঙ্গে মিশে সভ্য হয়ে ওঠে। নর্মানদের একটি শাখা সিসিলি ও ইটালিতে বসবাস শুরু করে ও সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। এইভাবে রোম সাম্রাজ্যের পতনের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সারা ইউরোপের জনসমাজে বিরাট পরিবর্তন ঘটে নূতন মানবজাতির জন্ম হয়।

উপনিবেশকারীদের উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব : বিশাল রোম সাম্রাজ্যের বিচিত্র জীবনযাত্রার মধ্যে একটি মিল ছিল সে হলো ধর্ম। চতুর্থ শতকে রোম সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেন। রাজকীয়

পৃষ্ঠপোষকতায় রোমের বিজিত অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হয়। ধীরে ধীরে বিজয়ী বর্বর জাতিরাও যেমন রোমান সভ্যতা সংস্কৃতি গ্রহণ করে তেমনি গ্রহণ করে খ্রীষ্টধর্ম। এমনকি তারা ধর্মগুরু পোপের অনুরোধে রোম নগরে অভিযান বন্ধ করে। জাতিগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ধর্মীয় ঐক্যে আবদ্ধ হয়। ক্রমাগত বহিঃশত্রুর আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু খ্রীষ্টীয় তীর্থনগরী রোমের মর্যাদা ও গৌরব বেঁচে থাকে। ধর্মগুরু পোপ খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের নিকট শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপের অন্ধকার যুগের প্রবাদ

(চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী)

৪র্থ থেকে ৭ম শতাব্দী অন্ধকার নয়ঃ চতুর্থ শতাব্দী থেকে উপযুক্ত শাসনকর্তার অভাবে রোমান সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। এই সুযোগে একদল যাযাবর জাতি রোম আক্রমণ করে। গথ, ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি জার্মান উপজাতি ও দুর্দান্ত প্রকৃতির হূণদের একটানা আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন সুনিশ্চিত হয়। চতুর্থ হতে সপ্তম শতক জুড়ে প্রায় তিন শতাব্দী এই অরাজক অবস্থা বজায় ছিল। এই বর্বর আক্রমণের যুগে ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা সংস্কৃতির চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। প্রাচীন সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উন্নত ছিল তার বহু কিছুই যাযাবর জাতির আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্য এই যুগকে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্ধকার যুগ বলে দেখা হতো। ইউরোপের মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করলেও জানা গেছে এই যুগেও বড় বড় প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির চিন্তাধারাও সে যুগে কোন না কোন ভাবে রক্ষিত হয়েছিল। পৃথীবির বেশ কিছু গৌরবময় সৌধ মধ্যযুগের প্রতিভার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল।

মধ্যযুগেই সাহিত্যরচনার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন জাতীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। এসব থেকে এখন আমাদের মতামত পরিবর্তন করে স্বীকার করতে হচ্ছে যে ইউরোপের মধ্যযুগ অন্ধকার যুগ নয় বরং এটা অন্ধকার যুগের প্রবাদ মাত্র।

অন্ধকার যুগে শিক্ষা সংস্কৃতি রক্ষায় মঠের ভূমিকা ঃ মধ্যযুগের প্রথম পর্বটা কাটে ধ্বংস, হত্যা আর অরাজকতার মধ্য দিয়ে। ক্রমে জার্মান উপজাতিরা বিভিন্ন দেশে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। শেষ পর্যন্ত এইসব আক্রমণকারী জাতিদের উপর খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থা, মঠ ইত্যাদির প্রভাব পড়ে। সেই কারণেই রোমের শিক্ষা সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়; শুরু হয় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা। প্রথম দিকে শিক্ষাদানের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন পাদ্রীরা। গীর্জাগুলো ছিল বিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে পাদ্রীরাই শিক্ষাদান করতেন। ধীরে ধীরে গীর্জাগুলিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট মঠ গড়ে ওঠে। এই মঠে পাদ্রী ও ধর্মযাজক ছাড়াও একশ্রেণীর জ্ঞান তপস্বী সন্ন্যাসী থাকতেন। এঁরা জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা দানে নিজেদের নিযুক্ত রাখতেন। এই সময়ের মঠগুলিতে শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। পরে খ্রীষ্টান মঠ ও চার্চগুলি রাজানুকূল্য লাভ করে। তখনকার শিক্ষার বিষয়বস্তুই ছিল ধর্ম ও দর্শন। শিক্ষকেরা মঠ বা গীর্জাতেই বাস করতেন। শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের ছিল অন্তরঙ্গ ও মধুর সম্পর্ক। সাধারণ অভিজাত পরিবারের ছেলেরা নিছক ধর্মীয় প্রচারের জন্যই শিক্ষা গ্রহণ করত। কিন্তু রাজ পরিবারের ছেলেরা রাজকার্যে পারদর্শিতা লাভের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করত।

এই সময় শিক্ষাগুরু হিসেবে পাদ্রী ও যাজকদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাঁরা ছিলেন সমাজের একমাত্র শিক্ষিত শ্রেণী। অন্ধকার আকাশের তারকার মত খ্রীষ্টীয় মঠগুলি অন্ধকার যুগে জ্বলজ্বল করছিল। এই মঠগুলিই ইউরোপে পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের পতনকাল থেকে শিক্ষা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

শিক্ষার পীঠস্থান এই মঠগুলিতে থাকত বড় বড় পাঠাগার, বিদ্যালয় ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে সন্ন্যাসীরা ল্যাটিন ভাষা শেখাতেন। তাঁদের অর্জিত

জ্ঞান সকলকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো রচনা। এঁরা বহু ধৈর্য সহকারে চামড়ার উপর খোদাই করে পুঁথি রচনা করতেন। অনেকের পাণ্ডুলিপি লিখে ও নকল করেই দিন কাটত।

সভ্যতা সৃষ্টিতে পাপ পুণ্য বোধের গুরুত্ব : গীর্জার পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকেরা প্রধানতা খ্রীষ্টধর্মের পবিত্র আদর্শ, ন্যায় নীতি সম্পর্কে সকলকে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা চার পাশের গ্রামে গিয়ে অজ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম প্রচার করতেন। খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ জনজীবনে প্রতিফলনের চেষ্টা করতেন। এইভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্মের মূল নীতি এবং আদর্শ প্রচার ও শিক্ষা দানের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে পাপ-পুণ্য-ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে। কোন্ কাজ করা উচিত কোন্ কাজ করা অনুচিত এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ থেকে অভিজাত, রাজা, পদস্থ রাজকর্মচারী সকলের মধ্যে আগ্রহ দেখা দিলো। রাজা প্রজা সম্পর্ক, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকলেই নীতি ও আদর্শের অনুসরণে মনোযোগী হয়ে উঠল। রাজারা কোন কাজ করার আগে ন্যায়নীতি দিয়ে বিচার করে দেখতেন। তাঁদের কোন কাজ খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ বিরোধী হলে সেটা করতেন না। বিজিত দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা সঙ্গত তাও খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ অনুযায়ী বিচার করে দেখতেন। এজন্যই তাঁরা যে কোন কাজ করার আগে খ্রীষ্টীয় ধর্ম যাজকদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতেন। তাঁদের অভিমতের মূল্য দিতেন। এমনি ভাবে খ্রীষ্টধর্ম ও তার আদর্শ মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। ক্রমে ইউরোপের দেশে দেশে মঠ গীর্জাকে কেন্দ্র করে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। খ্রীষ্টীয় আদর্শে সৎ পবিত্র জীবন যাপনের আদর্শ স্থাপিত হয়। পরবর্তী যুগে এই ধর্মীয় শিক্ষা সকল খ্রীষ্টধর্মীয় মানুষদের আদর্শ জীবন যাপনে অনুপ্রেরণা যোগায়। দীর্ঘ কয়েক শতক এরূপ পবিত্র নীতি বোধ ও আদর্শ নিষ্ঠ জীবন যাপনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ অক্ষুণ্ন ছিল। সে যুগে নূতন করে সভ্যতা সৃষ্টিতে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাইজানটাইন সভ্যতা

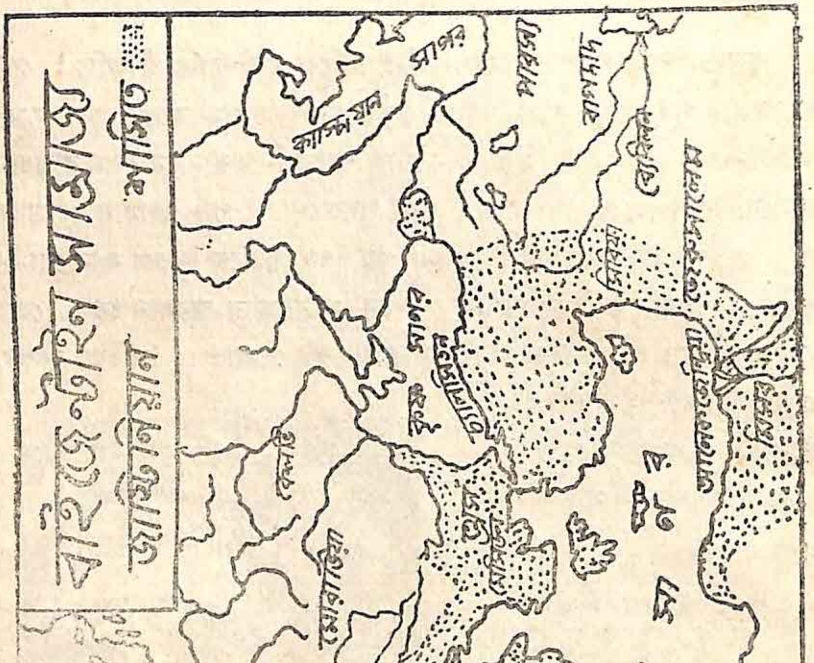
কনস্টান্টিনোপলের পত্তন ও খ্রীষ্ট ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি : রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্রাট কনস্টানটাইন ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন গ্রীক শহরে নিজের নামে নূতন রাজধানী **কনস্টান্টিনোপল** স্থাপন করেন। এই সময় থেকেই পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সূচনা হয় ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্বররা যখন রোমীয় সম্রাটকে বিতাড়িত করে তখনই পশ্চিম সাম্রাজ্যের অবসান হয়। রোম সাম্রাজ্য বলতে তখন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যকেই বোঝাত। সিরিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনরে সমৃদ্ধিশালী স্থানগুলি ও বলকান প্রদেশ নিয়ে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।



সম্রাট কনস্টানটাইন

রোমে খ্রীষ্টধর্ম দীর্ঘদিন রাষ্টীয় স্বীকৃতি লাভ করেনি। প্রায় ৪০০ বছর তীব্র সরকারী অত্যাচারের মধ্যেও খ্রীষ্টধর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত রোম সম্রাট এই ধর্মকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। সম্রাট কনস্টানটাইনই **মিলনের অনুশাসন**-এ এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে ধর্মীয় হত্যা বন্ধ করেন ও প্রচার করেন সারা সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম স্বীকৃত হল। কনস্টানটাইন তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন খ্রীষ্টধর্মকে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতির কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এই সময় থেকে রাষ্ট্রের সমর্থনে

ও আনুকূল্যে খ্রীষ্টধর্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে অন্যান্য ধর্ম রোম থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সাম্রাজ্যে চার্চের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।



এমনকি স্বয়ং সম্রাট অমানবিক কাজ করলে তাঁকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা খ্রীষ্টীয় ধর্মগুরুর ছিল।

জাস্টিনিয়ানের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা ঃ

এক হাজার বৎসরেরও বেশী সময় রোম সম্রাটগণ প্রাচ্যে রাজত্ব করেছিলেন। এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে যে নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে তা হলো সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান। প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের তিনি শ্রেষ্ঠ সম্রাট। জাস্টিনিয়ান ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজদণ্ড হাত নেন। জাস্টিনিয়ানের জন্ম হয়েছিল এক কৃষক বংশে। তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। তাঁর চরিত্রে বিভিন্ন বিরোধী গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। একদিকে তিনি ছিলেন বীর, বুদ্ধিমান, অক্লান্তকর্মী অন্যদিকে ছিলেন চরম স্বেচ্ছাচারী, জাঁকজমকপ্রিয়, লোভী, অকৃতজ্ঞ ও সন্দেহচেতা। রোমের হারিয়ে যাওয়া গৌরবকে ফিরিয়ে আনাই ছিল জাস্টিনিয়ানের একমাত্র চিন্তা। তিনি নিজেকে এই কাজেই সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি বলতেন অকর্মণ্যতার জন্য রোমানরা যে বিশাল সাম্রাজ্য হারিয়েছে তা পুনরুদ্ধার



সভাসদসহ সম্রাট জাস্টিনিয়ান

করাই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। বেলিসেরিয়াস নামে এক অসাধারণ সমরনেতাকে তিনি তাঁর প্রধান সহায় হিসেবে পেয়েছিলেন। পশ্চিমে অধিষ্ঠিত বর্বরদের বিতাড়িত করবার দায়িত্ব তিনি বেলিসেরিয়াসের উপর দিয়েছিলেন।

বেলিসেরিয়াস ভ্যাণ্ডালদের পরাজিত করে উত্তর আফ্রিকা মুক্ত করেন;

পূর্বগথদের তাড়িয়ে দিয়ে ইটালি পুনরুদ্ধার করেন। দক্ষিণ স্পেনের কিছু অংশ থেকে পশ্চিম গথদের বিতাড়িত করেন। রোম সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ উদ্ধার করতে না পারলেও জাস্টিনিয়ান জার্মানীর বর্বরদের উপর কঠোর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সম্রাট তাঁর সব ক্ষমতা একটি অখণ্ড খ্রীষ্টীয় সাম্রাজ্য গড়বার চেষ্টায় উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু জাস্টিনিয়ান পশ্চিম জয়ে এত নিমগ্ন ছিলেন যে পূর্বদিকে পারসিকরা তাঁর সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে থাকে। ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বেলিসেরিয়াস পারসিকদের পরাজিত করেন। কিন্তু বেশীদিন সেই বিজয় স্থায়ী হয়নি।

জাস্টিনিয়ানের আইন সংহিতা ঃ জাস্টিনিয়ানের মহৎকীর্তি হলো **'কর্পাস জুরিস'** বা **'রোমীয় আইন সংহিতা'** রচনা। জাস্টিনিয়ান লিখিত আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। শত শত বছর ধরে রোমে যে আইনগুলির সৃষ্টি হয়েছিল ও রোমের জীবন যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, যে আইন ছিল রোম সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—তিনি সেগুলিকে সংগ্রহ করে ঐ সংহিতা রচনা করান। জাস্টিনিয়ান এই কাজে দুজন দক্ষ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। চার বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর এই সংহিতা শেষ হয়। সংহিতাটি তিনটি অংশে বিভক্ত, **মূল সংহিতা** বা **কোড**—এর মধ্যে আছে বিভিন্ন সময়ে রোম রাষ্ট্রের তৈরী আইনগুলি। **ডাইজেস্ট** অংশে আছে রোমের আইনজ্ঞ ও ব্যবহারজীবিদের দ্বারা লিখিত আইনগুলি। **ইনষ্টিটিউট** অংশে আছে রোমান আইন কিভাবে তৈরী হয়েছিল ও কেন তৈরী হয়েছিল তার ব্যাখ্যা। জাস্টিনিয়ানের আইন সংহিতা সারা পৃথিবীতে প্রভাব ফেলেছিল। এখনও ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই আইন সংহিতাকে কম-বেশী অনুসরণ করে। এটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থটি এখনও একই রূপে পাওয়া যায়। ত্রিশ জন আইনজ্ঞের গবেষণা মূলক প্রবন্ধ সহ এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। আজও আইন জগতে এই গ্রন্থটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

সেই সময় রোম প্রশাসনের অর্থনীতি, পুলিশী ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, ও কর বিভাগে চরম দুর্নীতি ও অন্যায় বাসা বেঁধেছিল। জাস্টিনিয়ানের আইন সংহিতা তৈরীর ফলে এই সকল দুর্নীতি ও অন্যায়কে ঘৃণা করতে

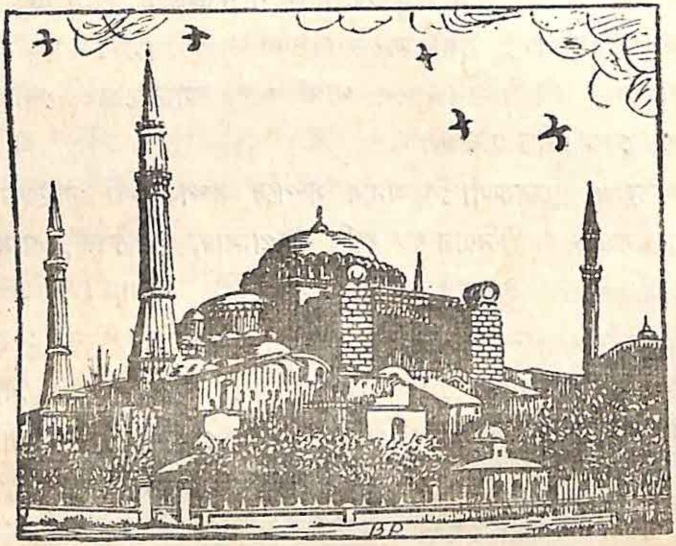
সাধারণ মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়। প্রশাসনে অধিষ্ঠিত যে উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীরা ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রজাদের অসুবিধা সৃষ্টি করতেন তা অনেকাংশে কমে যায়। এই আইন সংহিতা রচনার ফলে বিচারের নিষ্পত্তি দ্রুততর হয়। এই আইন রচনার ফলে যারা বিচারে সন্তুষ্ট হতে পারত না তারা সম্রাটের কাছে আবেদন করতে পারত। এই আইনের বলে নাগরিকদের কাছ থেকে জোর করে কিছু কেড়ে নেওয়া বন্ধ হয়েছিল।

স্থাপত্য ও চিত্রকলা ঃ অগাধ সম্পদে সম্পদশালী বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট জাস্টিনিয়ান বহু দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, লাইব্রেরী, স্নানাগার, হাসপাতাল, গীর্জা ইত্যাদি নির্মাণে উৎসাহী ছিলেন। এছাড়াও কনস্টান্টিনোপলের মনোরম সেতু, যাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, থিয়েটার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান তার গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। সৌন্দর্য ও শিল্পে সেদিনের পৃথিবীতে কনস্টান্টিনোপল ছিল শ্রেষ্ঠ শহর। সেখানকার রাজপ্রাসাদ, রাজসভার জাঁকজমক, সাজসজ্জা, আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা মানুষকে বিস্মিত করত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ জিনিষ সংগ্রহ করে আনা হতো। সোনা, রূপা, বহু মূল্যবান পাথর দিয়ে সাজানো হতো কনস্টান্টিনোপলকে। প্রাসাদের মেঝে দেওয়াল সাজানো হতো। সোনার পাখি, কলের ঘড়ি, মূল্যবান খেলনা রাজপ্রাসাদ ও দরবারের সমৃদ্ধি ঘোষণা করত।

ভাস্কর্য শিল্পে বাইজানটাইনের অধিবাসীরা উন্নতি করতে পারেনি কারণ মানুষের মহিমা প্রচার সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু স্থাপত্য শিল্পে বাইজানটাইন চরম উন্নতি করে। তাদের স্থাপত্য ছিল অপার্থিব সৌন্দর্য মণ্ডিত। চরম জাঁকজমকপূর্ণ সজ্জা ও কারিগরিতে এই স্থাপত্য শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছিল। তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল প্রাচ্য সভ্যতার রঙের চমক।

বাইজানটাইন সভ্যতার চরম শিল্পোন্নতির নিদর্শন হলো সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা। জাস্টিনিয়ান বহুল সম্পদ ব্যয় করে এই গীর্জা গড়ে তুলেছিলেন। দশ হাজার লোক পাঁচ বছর পরিশ্রম করে এই অতুলনীয় গীর্জা তৈরী করে। এই গীর্জার বাইরের সজ্জার চেয়ে ভিতরের দিকেই বেশী নজর দেওয়া হয়। ১৫০ ফুট উঁচু এই গীর্জার ভিতরে একটি বিশাল গোলাকার ছাদ ছিল। এটি এত অপূর্ব ছিল যে একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে এটি যেন সোনার

চেন দিয়ে স্বর্গ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইজানটিয়ামের একজন কবি বলেছেন "ধরাতলে স্বর্গের একটি টুকরো যেন খসে পড়েছে।" গীর্জার



সেন্ট সোফিয়া গীর্জা

ভিতরের রঙবেরঙের মার্বেল পাথর, মসৃণ মার্বেলের স্তম্ভ, লাল ও সোনালী রংয়ের কাঁচের মোজাইকে চোখ ঝলসানো কারুকার্যে গীর্জাটি অবর্ণনীয় ছিল। এখানকার স্বর্ণ, রৌপ্য ও এনামেলের কারুকার্য ছিল অতুলনীয়। মোজাইকের বহু মূল্যবান সহস্রাধিক রঙীন পাথর দিয়ে গীর্জার দেওয়ালে ধর্মীয় দৃশ্য চিত্রিত করা হয়েছিল। সোনার পাতের ওপর পাথর বসিয়ে এগুলি করা হয়েছিল। এই সেন্ট সোফিয়া গীর্জা এত বিস্ময়কর জাঁকজমক-পূর্ণ হয়েছিল যে উদ্বোধনের দিন সম্রাট প্রবেশ করেই বলে উঠেছিলেন, "মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি এই রকম একটি মহৎ কাজের জন্য আমাকে যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন।" কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর বিজয়ী অটোমানগণ এই অতুলনীয় গীর্জাটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন।

বাইজানটাইন জীবন ও সভ্যতা :

ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র : বাইজানটাইনে প্রতিষ্ঠিত শান্তি শৃঙ্খলা

ব্যবসা বাণিজ্যের পথ সুগম করেছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনার ফলে জনসাধারণ অধিক উৎপাদন করতে উৎসাহ পেত। বিভিন্ন প্রদেশ বিশেষ বিশেষ উৎপাদনের প্রতিযোগিতা করত। মিশর প্রচুর গম রপ্তানী করত। গ্রীস রপ্তানী করত পশম। লেবানন উৎপন্ন করত বহু মূল্যবান কাঠ। আরব থেকে আমদানী করত বিভিন্ন মশলা।

চীন থেকে স্থলপথে উটের পিঠে আসত সিল্ক। কিন্তু এই মন্থর পরিবহণ ব্যবস্থা বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল। জাস্টিনিয়ান আরও দ্রুততর ব্যবস্থার কথা ভাবলেন। তিনি বাইজানটাইনে সিল্ক উৎপাদন করার কথা চিন্তা করলেন। জাস্টিনিয়ান খোঁজ নিয়ে জানলেন সর্বাপেক্ষা ভাল জাতের রেশম গুটি তুঁত গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। কিন্তু সেই রেশমগুটি তখন পর্যন্ত চীন দেশেই পাওয়া যেত। চীনারা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখত যাতে এই গুটি পোকা অন্য দেশের অধিবাসী নিয়ে যেতে না পারে। তারা রেশমের একচেটিয়া ব্যবসা করত। সম্রাট গোপনে এই রেশম পোকা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। দুজন সাধু চীন দেশ থেকে রেশম পোকার ডিম ফাঁকা বাঁশের মধ্যে ভরে নিয়ে আসেন। তখন থেকে রোম সাম্রাজ্যে রেশম উৎপাদন আরম্ভ হয়।

বিলাসিতা ও জাঁকজমকের উপাদান সংগ্রহের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য আরও জোরদার হয়। আরব সাগর, লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে তখন বাণিজ্য পথ ছিল। স্থলপথে মিশর, রাশিয়া, ইথিওপিয়া, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত।

বাইজানটাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতিঃ বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব শান্তি শৃঙ্খলা ও জ্ঞান চর্চার পরিবেশ গড়ে তুলে ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত সামরিক ব্যবস্থা ছিল। সমৃদ্ধশালী বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের কর্মকেন্দ্র ছিল এর রাজধানী। এশিয়া ও ইউরোপের মিলন স্থলে সাতটি পাহাড়ের চূড়ায় এই সাম্রাজ্যের অতুলনীয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবস্থিত ছিল।

কনস্টান্টিনোপল-এ গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন হতো। বর্বর আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হলে বাইজানটাইনের

পণ্ডিতগণই গ্রীক সভ্যতা ও সাহিত্যকে রক্ষা করেন। প্রাচীন বাইজানটাইন ছিল গ্রীক শহর। তাই বাইজানটাইন সভ্যতা, ধর্ম-কর্ম সংস্কার, আচার ব্যবহার, ভাব ভাষা প্রভৃতি সব বিষয়ই ছিল গ্রীক আদর্শে তৈরী। গ্রীক ভাষা গ্রীক পদ্ধতিতে খ্রীষ্ট ধর্মের অনুষ্ঠানাদি পালিত হতো।

বাইজানটাইনের সাহিত্য সাধনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গ্রীক ও রোমের সাহিত্য, দর্শন ও বৈজ্ঞানিক রচনার অনুবাদ। তাঁরা নিজেরাও সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা করতেন। অনুবাদের সঙ্গে মৌলিক রচনাও তাঁরা প্রচার করতেন। বাইজানটাইনে মানবতাবাদী রূপে খ্যাত একদল পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমে মানুষের মূল্য ছিল সবার উপরে। তাঁরা বহু পুরাতন পুঁথি লিখে রেখেছিলেন। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের পর তাঁরা সেগুলি নিয়ে পশ্চিম ইউরোপে চলে যান। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গ্রীক ভাষায় লেখা নিউ টেস্টামেণ্ট।

বাইজানটাইনের অধিবাসীরা 'গ্রীক ফায়ার' নামে এক প্রকার রাসায়নিক বস্তু তৈরী করতেন। নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে তৈরি করা এই আগুন যুদ্ধে ব্যবহার করা হতো।

বাইজানটাইনের অমূল্য সাহিত্যকীর্তির মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হলো আদি গ্রীক ও রোমান সাহিত্য। নাটক, দর্শন শাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মূলক গ্রন্থগুলির অনুলিপি করে রাখা হয়েছিল। তাঁরা নিজেরাও মৌলিক সৃষ্টি করেছিলেন। এইসব সাহিত্যকীর্তি প্রদেশে প্রদেশে প্রচার করা হতো।

অবশেষে একদিন এই সমৃদ্ধশালী বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে এলো। কয়েক শতাব্দী ধরে পারসিক, আরব ও তুর্কীগণের সঙ্গে যুদ্ধ করে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, হত্যা, ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি, বিলাসিতা বাইজানটাইন জীবনকে অন্তঃসারশূন্য করে তোলে। রাজসিংহাসন লাভের জন্য সাংঘাতিক রেষারেষি ও জঘন্য হত্যাকাণ্ড চলত। একদিকে আকাশচুম্বী ঐশ্বর্য ও বিলাসের প্রাচুর্য, অন্যদিকে দারিদ্র, দাসত্ব, নির্যাতন, অত্যাচার সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল। গ্রীক ও রোম অনুসারী খ্রীষ্ট ধর্মের দুই গোষ্ঠীতে বিবাদ রাষ্ট্রের ঐক্যকে শেষ করে দেয়। সাম্রাজ্যের

বাইরের ও ভিতরের এত সঙ্কটের সঙ্গে মোকাবিলা করা কোন শাসকের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। সম্রাটরা প্রায়ই ষড়যন্ত্রের ফলে সিংহাসনচ্যুত অথবা নিহত হতেন। সাম্রাজ্যের অশান্তি, সম্রাটদের অপদার্থতা, ধনিকশ্রেণীর অত্যাচার ও বিলাসিতা এবং সৈন্যদলের বিদ্রোহে সাম্রাজ্যের ভিত নড়বড়ে হয়ে ওঠে। আর তুর্কীদের আক্রমণে সেই জীর্ণ সৌধ চুরমার হয়ে যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

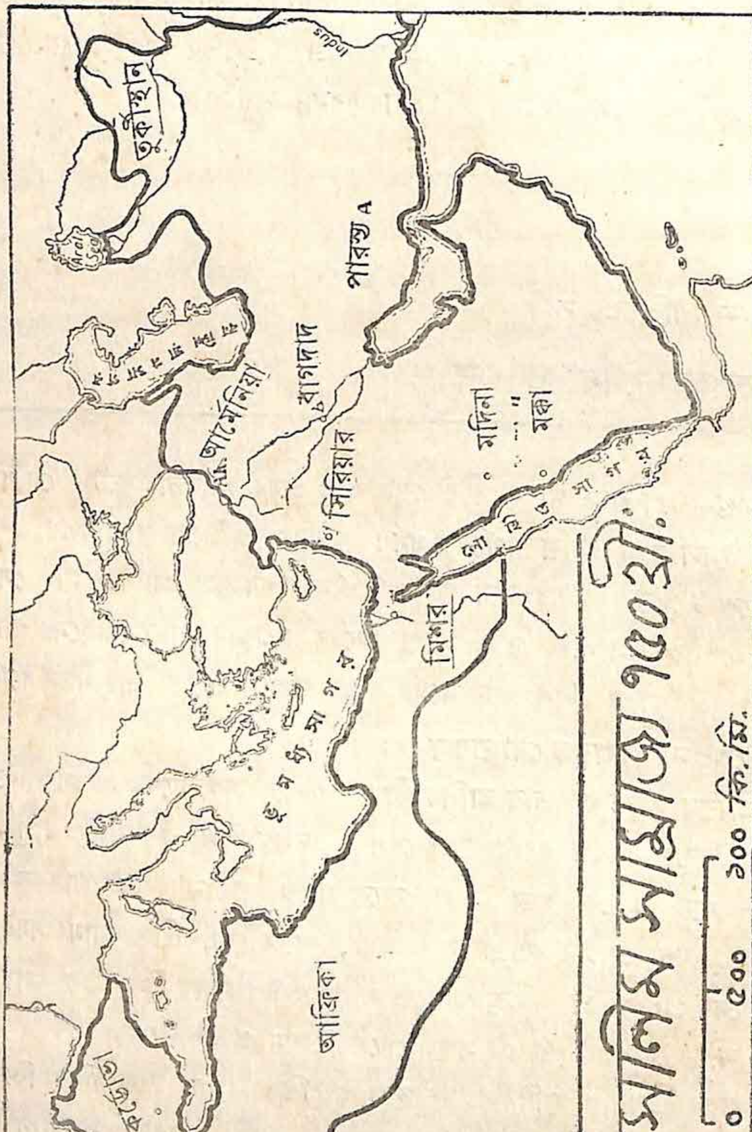
ইসলাম ধর্মের প্রভাব

সপ্তম শতাব্দীতে আরব দেশে একটি সত্য ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। সে ধর্ম হলো **ইসলাম** বা **আত্মসমর্পণের ধর্ম**। তখন যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পর ৬০০ বছর কেটে গেছে। ভারতবর্ষে তখন হর্ষবর্ধনের একচ্ছত্র আধিপত্য। সেই সময় লোহিত সাগরের তীরে যীশু খ্রীষ্টের জন্মভূমি প্যালেষ্টাইনের প্রায় কাছাকাছি আরব দেশে এই ধর্মের প্রথম প্রকাশ ঘটে। এই নূতন ধর্মের প্রবর্তকের নাম **হজরত মোহাম্মদ (সঃ)**।

আরব দেশ ও তার অধিবাসী ঃ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম দিকের বিস্তৃত উপদ্বীপ হলো আরব দেশ। দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির বালুকা-রাশি দিয়ে এ দেশ গড়া। তার মাঝে আছে মরূদ্যান। এই আরবভূমির চারদিকে বহু প্রাচীন সাম্রাজ্য (মিশর, আসিরিয়া, গ্রীস, রোম সবই) আরবদের প্রতিবেশী। কিন্তু লোহিত সাগরের উপকূলের কিছু কিছু জায়গা ছাড়া আরব দেশের উপর এই সকল দেশের কোন প্রভাব পড়েনি।

আরব উপদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এর উত্তর দিকে বিরাট মরুপ্রান্তর, মেসোপটেমিয়া ও ভূমধ্যসাগর। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও আফ্রিকা। পূর্বে আরব সাগর, পারস্য উপসাগর এবং ভারতবর্ষ। পশ্চিমে রয়েছে লোহিত সাগর ও আফ্রিকা। আমাদের দেশের মত আরব দেশ

সুজলা সুফলা নয়। সারা দেশ জুড়ে কোথাও আছে কঠিন পাহাড় আবার কোথাও বা ধূধূ বালুকারাশি। সেখানে বাণিজ্য উপযোগী কোন নদনদী



নেই। আছে কেবল ছোট ছোট খাত ও জলাশয়। দেশের কোন কোন

অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। তাই জীবন ধারণের পথ অনেকটা সহজ। আর আছে মরুভূমির মাঝে ছোট ছোট মরূদ্যান। এই মরূদ্যান এলাকায় কিছু গাছপালা জন্মায় ও জলের সন্ধান পাওয়া যায়।

আরব জাতি আদ, সামুদ প্রভৃতির বংশধর। আরব জাতির চরিত্রের উপর ভৌগোলিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। আরবের লোকসংখ্যা খুবই কম। আরবের অধিবাসীরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—শহরবাসী ও বেদুইন। কৃষিকাজ ও ব্যবসা তাদের প্রধান জীবিকা। বেদুইনরা মরুভূমির বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াত। পশুপালন ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। বেদুইনরা ছিল রুক্ষ ও দুর্ধর্ষ। খুন, জখম ও লুঠতরাজ তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী ছিল। সমাজ জীবন বলতে কিছু ছিলনা। তারা ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা খুব স্বাধীনচেতা ও অতিথিপরায়ণ ছিল।

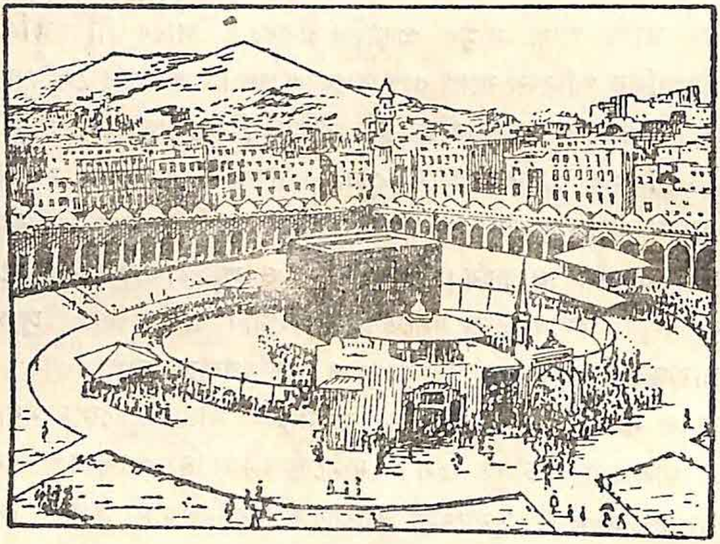
আরবের সমাজ জীবন ছিল অত্যন্ত নীচু। নারীদের কোন মর্যাদা ছিলনা। দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। দাসদের জীবন ছিল পশুদেরও অধম। ঝগড়া বিবাদ, মদ্যপান, জুয়াখেলা আরববাসীদের নিত্যসঙ্গী ছিল। কন্যা সন্তান জন্মালেই তাকে মেরে ফেলা হতো।

একেশ্বরবাদের ধর্ম প্রচলিত থাকলেও খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা ছাড়া সকলেই মূর্তিপূজা করত। প্রত্যেক গোত্রের পৃথক দেবতা ছিল। মক্কা ছিল তাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল। এখানে বহু দেবদেবী ছিল। আর ছিল একটি কাল-পাথর। এই পাথরকে সব গোত্রই দেবতাদের উর্ধ্বে স্থান দিত। যতই হানাহানি করুক তারা মক্কার পবিত্রতা নষ্ট হতে দিত না। বছরের চার মাস তারা সব শত্রুতা ভুলে মক্কায় এসে জড়ো হতো ও কা'বায় পূজা দিত।

প্রাচীন কাল থেকেই আরবীয়রা ব্যবসা বাণিজ্য করত। মক্কা বাণিজ্য কেন্দ্রও হয়ে ওঠে। আরবদের সাহিত্য ছিল কবিতা ও গান। আরবীয় কবিরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন ও কাব্য শোনাতেন। কবিতার প্রতিযোগিতাও হতো। ইতিহাস, নীতিকথা ও কাব্যাকারে লেখা হতো।

হজরত মোহাম্মদ ও তাঁর শিক্ষা : ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ মক্কার সম্ভ্রান্ত কোরায়েশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্ ও মাতার নাম আমিনা। মাতা আমিনা শিশু

মোহাম্মদের নাম রাখলেন আহ্‌মদ। জন্মের ছ'মাস আগে পিতা এবং ছ' বছর পরে মা আমিনা ইহলোক ত্যাগ করেন।



মক্কার কা'বা গৃহ

শিশু মোহাম্মদ ধাত্রী হালিমার কাছে লালিত পালিত হন। পিতা মাতার মৃত্যুর পর মোহাম্মদের প্রতিপালনের ভার পড়ে পিতামহ আব্দুল মোত্তালেবের উপর। পিতামহের মৃত্যুর পর পিতৃব্য আবুতালেব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের জন্য কোমল স্বভাব মিষ্টভাষী বালক মোহাম্মদকেও পশু চরাতে হতো। অন্যের দুঃখকষ্টে ব্যথিত হতেন। সত্যবাদিতার জন্য আরবীয়রা তাঁকে "আল আমিন" আখ্যা দিয়েছিল। বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী বলে খাদিজা নাম্নী এক বর্ষীয়সী ধনী বিধবা নিজ ব্যবসার সমূহ দায়িত্ব তাঁকে দেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি লাভ করেন। পররর্তীকালে খাদিজার প্রস্তাবে হজরত মোহাম্মদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

এই সময় থেকে তিনি ধর্মচিন্তায় মন দেন। মক্কার অদূরে হেরা নামক পর্বত গুহায় তিনি ধ্যান করতে শুরু করেন। এই গুহাতেই তিনি দিব্যজ্ঞান

(নবুয়ত) লাভ করেন। এরপর তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল 'আল্লাহ্' এক এবং অদ্বিতীয় তাঁর কোন অংশীদার নেই; হজরত মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ। একেশ্বরবাদ প্রচারের ফলে পুরোহিত সম্প্রদায় মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কোরায়েশদের উত্তেজিত করতে লাগলো। তারা তাঁর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলল। তখন বাধ্য হয়ে তিনি সঙ্গীগণ সহ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই মদিনায় হিজরত বা প্রস্থান করেন। এই প্রস্থান বা হিজরতের দিন থেকেই হিজরী সাল গণনা করা হয়। মদিনা বাসীরা হজরতকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে তাঁদেরকে আনসার বলা হয়। তিনি মদিনাবাসীদের মধ্যে অনৈক্যকে দূর করেন। হজরত মোহাম্মদ দিনে পাঁচবার নামাজ পড়া ও রমজান মাসে রোজা রাখার নির্দেশ দেন। মদ্যপান, জুয়াখেলা, লুঠতরাজ ও অন্যান্য খারাপ কাজ নিষিদ্ধ করেন।

কোরআনঃ ইসলাম ধর্মের নীতি সম্বলিত গ্রন্থ। কোরআন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলির অন্যতম। কোরআনের বাণী ঐশ্বরিক। হজরত মোহাম্মদের সঙ্গীগণ এইসব বাণী মুখস্থ করে রাখতেন কিংবা কোন জায়গায় লিখে রাখতেন। পরবর্তীকালে এই সকল বাণীকে একত্রিত করেই বর্তমান কোরআনের সংকলন করা হয়েছে। ইসলামের পাঁচটি প্রধান পালনীয় কর্তব্য ঃ (১) প্রত্যেক মুসলমানকে এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতে হবে। (২) পাঁচবার নামাজ পড়তে হবে। (৩) একমাস রোজা রাখতে হবে। (৪) দান করতে হবে। (৫) ধনশালীদের একবার মক্কায় হজ (তীর্থ) করতে হবে।

ইসলামের শিক্ষা হলো, সকল মানুষ সমান ও পরস্পরের ভাই। ধনী দরিদ্র, ছোট বড় সকলেই সমান। হিংসা, যুদ্ধ, নরহত্যা, লুণ্ঠন ও মদ্যপান নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ মানুষের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। অন্যের প্রতি অত্যাচার নিষিদ্ধ। অধীন দেশ ও জাতির প্রতি অত্যাচার অন্যায়। নির্দিষ্ট দিনে পৃথিবী ধ্বংস হবে। পাপপুণ্যের বিচার হবে এবং সেইমত শাস্তি হবে। প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর বিদ্যা শিক্ষা অবশ্য কর্তব্য। নারীদের মর্যাদা দিতে হবে। তা ছাড়াও হজরত মোহাম্মদের উপদেশ হলো কোরআনকে মেনে চলবে। ধর্মের বাণী অন্যের নিকট পৌঁছে দেবে। ধর্ম নিয়ে মাতামাতি

করবে না। হজরত মোহাম্মদ পৃথিবীর মানুষের জন্য এই সকল শিক্ষা ও উপদেশ দিয়ে ৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন ৬৩ বছর বয়সে প্রার্থনারত অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

কি করে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়লঃ যে সময় সারা পৃথিবী কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দাস প্রথা, জমিদারী প্রথা, হানাহানি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, মদ্যপান, জুয়াখেলা, হত্যা মানুষের সমাজ জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে সেই সময় হজরত মোহাম্মদের সাম্যের বাণী নিয়ে ইসলাম ধর্ম শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। দরিদ্রের প্রতি ভালোবাসা, আর্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে আহার দান, নিজে না খেয়ে অপরকে খাওয়ানো, অপরাধীকে ক্ষমা করা প্রভৃতি শিক্ষাগুলির জন্য ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশ্ব মানব আকৃষ্ট হয়। মাত্র আট বছরে সমগ্র আরব দেশে ইসলাম প্রসারিত হয়। পারস্য ও বাইজানটাইন সম্রাটের নিকটও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য দূত প্রেরিত হয়। এইভাবে সারা বিশ্বে দ্রুত ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে।

খলিফাঃ হজরত মোহাম্মদ মৃত্যুর পূর্বে কাউকেই তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর উপস্থিত জন মণ্ডলীর অভিমত অনুযায়ী হজরত আবুবকরই জ্ঞান, বুদ্ধি, বয়স সব দিক থেকেই ছিলেন খলিফা পদের যোগ্য ব্যক্তি। তিনি নির্বাচিত হয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। সকল কাজে আমি তোমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। আমি যদি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে পারি তবে তোমরা আমাকে সমর্থন করো, এ কাজে ভুল ত্রুটি হলে তোমরা আমাকে পরামর্শ ও সাহায্য দিও। আমি যদি আল্লাহ ও তার প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদের বিধান লঙ্ঘন করি তবে আমাকে অগ্রাহ্য করো।" এই থেকে গণতান্ত্রিক পথে খলিফা নির্বাচন চালু হয়। এই সময় থেকে খলিফার শাসন (খেলাফত প্রথা) চালু হয়। খলিফার কর্তব্য হলো ইসলাম প্রচার ও ইসলামের বিধি নিয়ম অনুযায়ী প্রজা ও ইসলামী সাম্রাজ্য রক্ষা করা।

হজরত আবুবকরের মৃত্যুর পর হজরত ওমর সর্বসম্মতি ক্রমে মুসলিম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। হজরত ওমর ছিলেন সরল ও

অনাড়ম্বর। কঠোরতা, কোমলতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, সরলতা, অনাড়ম্বরতা, দয়ার্দ্রতা প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

হজরত ওমরের মৃত্যুর পর হজরত ওসমান ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। হজরত ওসমানের পর খলিফা হন হজরত আলী। এই সময় থেকেই খলিফা পদ নিয়ে দলাদলি শুরু হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোয়াবিয়া ছিলেন আলীর শত্রু। মোয়াবিয়ার চক্রান্তে হজরত আলী নিহত হন। সাহসে, বীরত্বে, জ্ঞানে, নিষ্ঠায়, মহত্ত্বে আলী সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন।

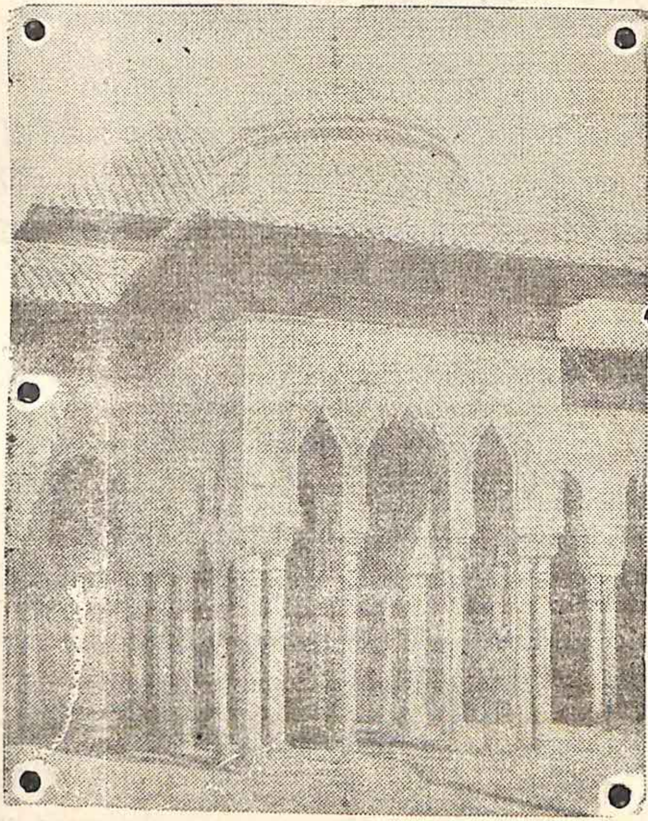
আলীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হজরত হাসান খলিফা হন। কিছুদিন পরে মোয়াবিয়া তাঁকে খলিফা পদ ছাড়তে বাধ্য করেন ও মোয়াবিয়া গোষ্ঠীর লোকেরা চক্রান্ত করে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। এইটাই হলো প্রথম **চার খলিফার যুগ**। পরে মোয়াবিয়া ও তাঁর অযোগ্য পুত্র এজিদ খলিফা হন।

খলিফা এজিদ ছিলেন নিষ্ঠুর মদ্যপায়ী ও চরিত্রহীন। ধার্মিক মুসলমানরা এই খলিফাকে পছন্দ করতেন না। হজরত আলীর দ্বিতীয় পুত্র হজরত হোসেন ইরাকের অন্তর্গত কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে খলিফা পদ গ্রহণের জন্য পরিবার ও কিছু অনুচর সহ মক্কা থেকে ইরাকে রওনা হন। কুফার পঁচিশ মাইল উত্তরে কারবালা নামক স্থানে পেঁাছে তিনি বুঝতে পারেন কুফাবাসীদের আবেদন পত্রটাই এজিদের চক্রান্ত। তিনি এজিদের ফাঁদে পা দিয়েছেন। কারাবালার জনহীন মরু প্রান্তরে এজিদের সৈন্যদল তাঁদের ঘিরে ফেলে। কয়েকদিন হোসেন ও তাঁর দলকে অবরোধ করে রাখে এবং জল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। জলাভাবে নারী ও শিশুদের শুকিয়ে মারা হয়। হোসেনের চোখের সামনেই একে একে তাঁর পুত্রদের তীরের আঘাতে হত্যা করা হয়। সবশেষে হোসেনকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই করুণকাহিনীই কারবালার ঘটনা বলে পরিচিত।

মোয়ারিয়ার সময় থেকেই ইসলামী সাম্রাজ্যে উমাইয়া গোষ্ঠীর শাসন শুরু হয়। পরবর্তীকালে আবুল আব্বাস উমাইয়া গোষ্ঠীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে আব্বাসীয় গোষ্ঠীর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের

খলিফা হারুণ-অ-রশীদের সময়ই মুসলিম সাম্রাজ্যে সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ ঘটে।

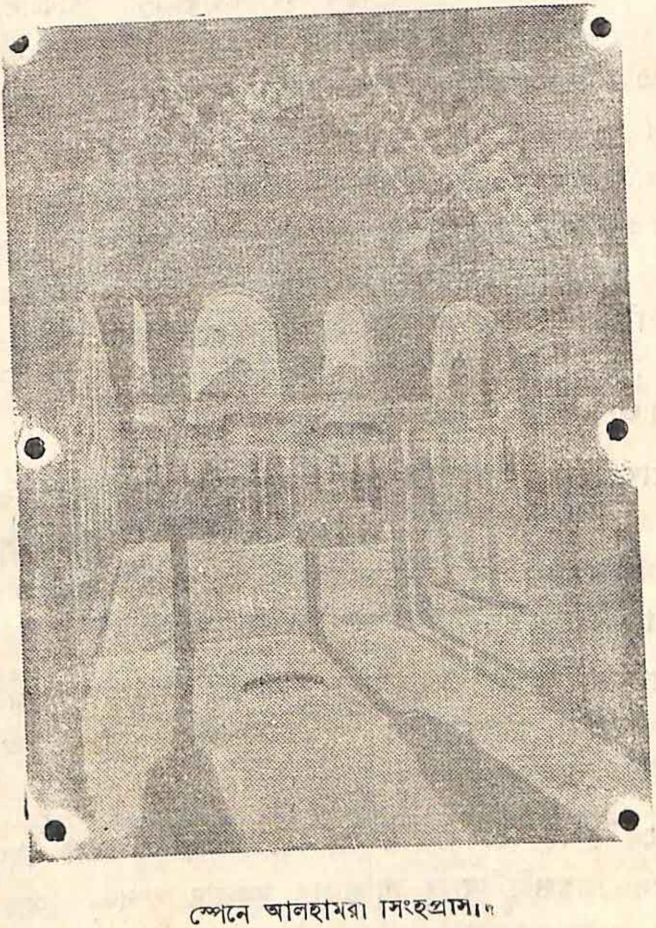
ইউরোপে মুসলিম শাসন ঃ আব্বাসীয় খলিফাদের যুগ আরব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ যুগ। এই সময় মুসলিমরা পশ্চিম স্পেন পর্যন্ত শাসন করত। পশ্চিম গথদের শাসনে স্পেনের দুরবস্থার শেষ ছিল না। আরবরা সেখানে গথদের পরাস্ত করে এক বিখ্যাত সভ্যতার সূচনা করে। স্পেনের



কর্ডোভার আলহামরা প্রাসাদ

আরবদের বলা হতো মুর। তাদের রাজধানী ছিল কর্দোভা। আরবরা স্পেন অধিকার করার পর সেখানে শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, গণিত আইন ও নানারকম কারিগরি বিদ্যার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে।

স্পেনের আরব শাসকরা উদার ও উন্নত চরিত্রের ছিলেন। স্পেনের খ্রীষ্টান ও ইহুদী প্রজারা এখানে নির্বিঘ্নে বাস করত। শিল্পে, কারিগরিবিদ্যায় মুররা বিস্ময়কর উন্নতি করে। জনসাধারণের জন্য বহু স্নানাগার, পাথর বাঁধানো প্রশস্ত রাজপথ, বহু মসজিদ, ফোয়ারা শোভিত মনোরম উদ্যান আরব সভ্যতার গৌরবের পরিচয় দিত। মর্মর প্রাসাদগুলি আলোর মালায়



স্পেনে আলহামরা সিংহপ্রাস।

ঝলমল করত। পুস্তকাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পচর্চা ও বহু পণ্ডিতের সমাবেশে মুর শাসিত স্পেন এক বিখ্যাত সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

বিশ্ব সভ্যতার আরবদের অবদান ঃ বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে

আরবদের দান অসীম। মধ্যযুগের অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানের শিখা প্রজ্বলিত রেখেছিলেন আরবরাই। প্রাচীন গ্রীক, পারসিক ইত্যাদি সভ্যতার বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতিকে তাঁরা কেবল বাঁচিয়েই রাখেননি—সমৃদ্ধও করেছিলেন। গ্রীক বিজ্ঞান, পারসিক দর্শন ও ভারতীয় গণিত ইত্যাদির সমন্বয়ে এক অসাধারণ চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানকে নিজেদের প্রতিভা স্পর্শে তাঁরা সমৃদ্ধ করে গিয়েছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন নানা শাস্ত্র চর্চা করার জন্য আয়াত-অল-হিকমা (জ্ঞানের আগার) নামে এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে একটি বিরাট পুস্তকাগার ও একটি অনুবাদ বিভাগ খোলেন।

আরব পণ্ডিতগণ সংস্কৃতির আকাশে ছিলেন এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্য আরবীতে অনূদিত হয়। অনুবাদকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **হুনাইন-ইবনে-ইশহাক**। তিনি অসাধারণ চিকিৎসকও ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ণ, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সকল বিভাগে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটিয়েছিলেন আরব পণ্ডিতগণ। এক একজন আরব পণ্ডিত ছিলেন চলন্ত বিশ্বকোষ।

আবু সিনা ছিলেন একাধারে ভাষাতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, চিকিৎসক ও কবি। মাত্র দশ বছর বয়সে সমগ্র কোরআন তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি আমীরের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত **ঔষধশাস্ত্র** বিখ্যাত গ্রন্থ।

ইবনে খলদূন ইসলামের ইতিহাস রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর রচিত সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিশ্বের ইতিহাস'। উত্তর আফ্রিকার টিউনিসিয়াতে তাঁর জন্ম হয়।

ইবনে রুশদ ছিলেন দার্শনিক জগতের সম্রাট। তাঁর লেখা দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি আরব সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি বহুকাল পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা হতো।

আল-বেরুনী মহাপণ্ডিত আবু-সিনার সমসাময়িক। তিনি গজনীর সুলতান মামুদের সভাসদ ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হিসেবে

খ্যাতিলাভ করেন। আবু-সিনা ও তাঁর পত্রাবলী আজও বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। আল-বেরুনী রচিত **ভারতের ইতিহাস** একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

ইবনে বতুতা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পর্যটক ও লেখক। তিনি সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ঘুরে ভারতে আসেন। তাঁর **সফরনামা** বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। **অল-তাবররীও** জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে মিশর, পারস্য, সিরিয়া, ইরাক পরিভ্রমণ করেন। **বিশ্বের ইতিহাস ও কোরআনের টীকা** তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। এঁরা ছাড়াও **অল-হাইসাম** ছিলেন শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি বিজ্ঞানী, **জুবের** ছিলেন রাসায়নিক, আল-রাজি ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী। এছাড়াও অসংখ্য প্রতিভাবান ব্যক্তি আরবের সংস্কৃতি সাধনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রাচ্য দেশীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা শেখেন আরবরা এবং ইউরোপকে তা শিক্ষা দেন। তার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান গড়ে ওঠে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

সূচনা ঃ শেষ রোমান সম্রাট ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম থেকে থেকে বিতাড়িত হলে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রোম সাম্রাজ্যের এই পতনের প্রধান কারণ হলো জার্মান যাযাবর জাতিগুলির একটানা আক্রমণ। এই সময় রোম সাম্রাজ্য বলতে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যকে বোঝাত। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব ও মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু আরব সাম্রাজ্যের সর্বব্যাপী প্রসারে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই সময় জার্মান বর্বরদের নেতা চার্লস মর্টেল ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে টুর-এর যুদ্ধে আরবদের পরাজিত করেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরবদের আক্রমণের সম্ভাবনা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত আতঙ্কের ব্যাপার ছিল। কারণ এর ফলে খ্রীষ্টান নগরী রোম ও তার ধর্মীয় প্রধান পোপের প্রভাব

ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ফ্র্যাঙ্কবীর চার্লস মর্টেল এই অসাধারণ বীরত্ব ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য রোমের সম্রাট মনোনীত হন। এই ঘটনা মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যময়। এই সময় থেকেই লুপ্ত রোমান সভ্যতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস মর্টেল দেহত্যাগ করেন।

শার্লেমনের সাম্রাজ্য ঃ

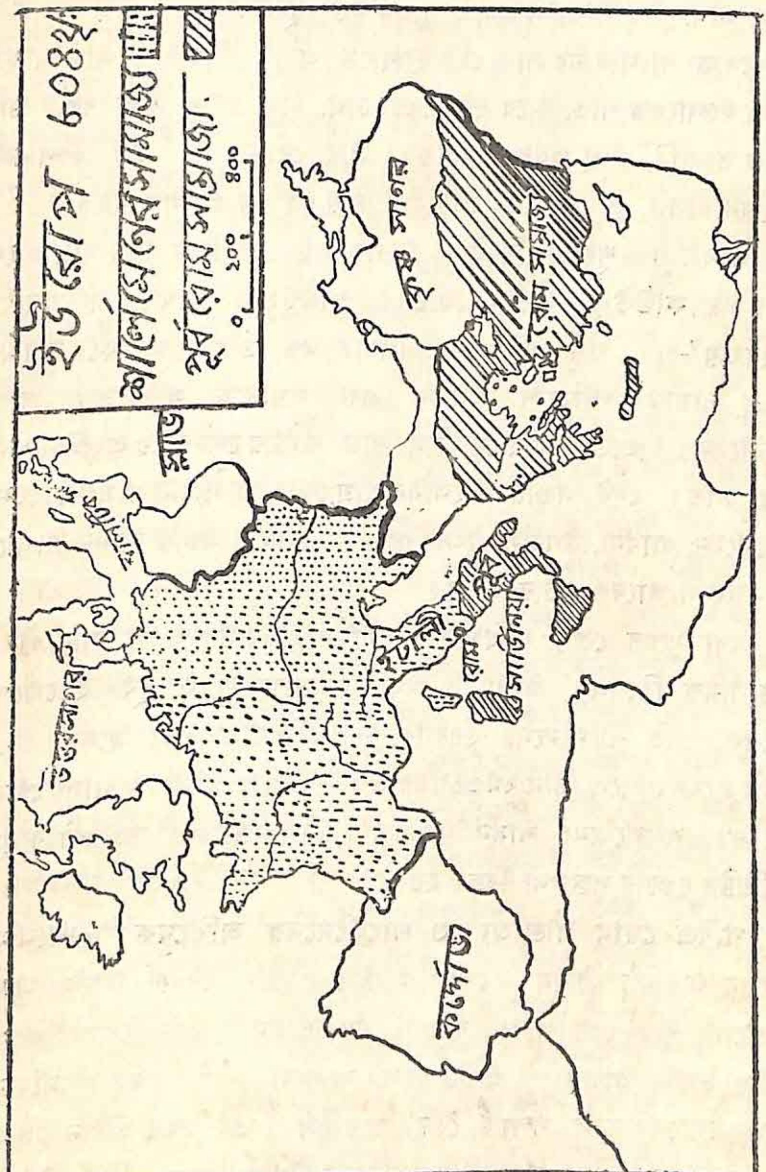
পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গঠন ঃ চার্লস মর্টেলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চার্লস দি গ্রেট বা **শার্লেমেন** শাসনভার গ্রহণ করেন। শার্লেমেন কেবল জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠ সম্রাট নন, বিশ্ব ইতিহাসেরও একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে শার্লেমেন ফ্রাঙ্কদের রাজা হন। তিনি বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রশীদের সমসাময়িক ছিলেন। এগিন হার্ডের লেখা শার্লেমেন-এর জীবনী থেকে আমরা তাঁর সম্পর্কে জানতে পারি। এগিন হার্ড বলেছেন শার্লেমেন ছিলেন দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। তাঁর চুল ছিল সাদা, চোখ উজ্জল, নাক টিকালো। তাঁর গায়ে ছিল অসাধারণ শক্তি ও অমানুষিক পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ছিল। প্রাতঃকালে পোষাক পরতে পরতে তিনি বিচারের কাজ শেষ করতেন। তিনি খুব মিশুক, কৌতুকপ্রিয় ও অনিসন্ধিৎসু ছিলেন। রাজকর্মচারী ও অভিজাতদের সঙ্গে তিনি সহজভাবে মিশতেন। তিনি প্রতিটি বিষয় গভীরভাবে বুঝবার চেষ্টা করতেন।



সম্রাট শার্লেমেন

শার্লেমেন-এর সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধ বিগ্রহে কাটে।

পঞ্চাশটিরও বেশী যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে



তোলেন। শার্লেমনের সাম্রাজ্যের উত্তর পূর্ব সীমানা এলন নদী অতিক্রম করে যায়। তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল বর্তমান ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড,

সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, পশ্চিম জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার কিছু অংশ, উত্তর ইতালি এবং স্পেনের উত্তর পূর্বাঞ্চল।

যোদ্ধা শার্লেমেনের সারা দেহ ইস্পাতে আবৃত থাকত। আর থাকত হাতে ইস্পাতের পাত, কাঁধে ইস্পাতের ঢাল, বাম হাতে তীক্ষ্ণ বর্শা, ডান হাতে তরবারি, জানু পর্যন্ত বর্মাবৃত। তাঁর ঘোড়ার রং ছিল ইস্পাতের মত ঘন নীল। শার্লেমেনের শৌর্যবীর্য নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে।

সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য শার্লেমেন সারা সাম্রাজ্যকে কয়েকটি কাউন্ট-এ বিভক্ত করেন। কাউন্টগুলি দেখাশোনা করতেন "এনভয়"-রা। সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্য তাঁরা দুজন করে নিয়মিত ভাবে সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করতেন এবং সম্রাটকে সাম্রাজ্যের অবস্থা জানাতেন। প্রত্যেক বছর মে মাসে রাজ কর্মচারীদের নিয়ে একটি সাধারণ সভা বসত। সেই সভায় শার্লেমেন সাম্রাজ্যের বহু সংবাদ সংগ্রহ করতেন। শার্লেমেন, প্রার্থনা, উপবাস, উৎসব প্রভৃতি ধর্মীয় ও অন্যান্য নানান ব্যাপারে অনেকগুলি আদেশ প্রচার করেন।

মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী শার্লেমেন খ্রীষ্টধর্মের গভীর অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জার্মানীর অর্ধসভ্য স্যাক্সনগণ ও পূর্ব ইউরোপের অনেক জাতি শার্লেমেনের তরবারির ভয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সদ্য বিজিত দেশগুলিতে তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য দলে দলে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী প্রেরণ করেন। শার্লেমেনের শাসন দক্ষতায় রোম সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়।

পবিত্র রোম সাম্রাজ্য ও শার্লেমেনের অভিষেক : শার্লেমেন ছিলেন একনিষ্ঠ খ্রীষ্টান। পোপকে তাঁর পিতার দেওয়া বিশেষ অঞ্চল 'পোপের রাজ'-কে তিনিও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তখন পোপ ছিলেন খ্রীষ্টীয় চার্চের প্রধান ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের সর্বেসর্বা। পিতার মত শার্লেমেনের সঙ্গেও পোপের ভাল সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। এই সময় খ্রীষ্টান জগতের ধর্মগুরু মহান পোপ তৃতীয় লিও ছিলেন রোম নগরে। ৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রোমের অভিজাতরা পোপের সঙ্গে শত্রুতা শুরু করেন। শার্লেমেন পোপকে সাহায্যের জন্য সসৈন্যে রোমে আসেন এবং পোপকে তাঁর প্রাসাদে পুনরায়

অধিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পর খ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে শার্লেমেন রোমের সেণ্ট পিটার্স গীর্জায় প্রার্থনা করতে যান। প্রার্থনার পর পোপ তৃতীয় লিও হঠাৎ শার্লেমেনের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে তাঁকে রোমের সম্রাট দ্বিতীয় সীজার বলে ঘোষণা করেন। পোপ কর্তৃক শার্লেমেনের মাথায় মুকুট পরানোর ঘটনাকে মধ্যযুগের ইতিহাসে শার্লেমেনের অভিষেকরূপে উল্লেখ করা হয়। এই সময় থেকে শার্লেমেনের সাম্রাজ্য পবিত্র রোম সাম্রাজ্য নামে আখ্যা পায়।

প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে রোম সাম্রাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট হয়—রোম সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। পোপ শার্লেমেনকে রোম সম্রাটরূপে অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো। আবার পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটলো।

রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্ক ঃ পোপের পরিয়ে দেওয়া মুকুট মাথায় নিয়ে শার্লেমেনের যে অভিষেক হয়েছিল তার রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল বিরাট। পোপ রোম সম্রাট হিসেবে শার্লেমেনকে অভিষেক করার ফলে সম্রাটের উপরে খ্রীষ্টান চার্চ ও পোপের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রোম সম্রাটের পদ পবিত্র ও ধর্মানুমোদিত বলে গুরুত্ব লাভ করে। পোপ ধর্মীয় প্রধান হলেও রাজার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। শার্লেমেনের পুত্র লুই ছিলেন খুব ধর্মভীরু। তাই তিনি পোপের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। ফলে পোপের ক্ষমতা দিনের পর দিন বেড়েই চলে। এরপর সম্রাট ও পোপ কে বড় তাই নিয়ে ইউরোপের ইতিহাসে দীর্ঘকাল ব্যাপী বিরোধ চলে। এই বিরোধের বীজ পোপ কর্তৃক শার্লেমেনের অভিষেকের মধ্যেই নিহিত ছিল।

শার্লেমেনের শিল্প ও সাহিত্যানুরাগ ঃ রোমের সম্রাট ঘোষিত হওয়ার পর শার্লেমেন রোমসাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। রাইন নদীর তীরে তাঁর রাজধানী অ্যাকেন বা এইলা স্যাপেল-এর নাম রাখা হয়েছিল নূতন রোম। তাঁর আদেশে এক কালের রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী র‍্যাভেনা থেকে নূতন রোম নির্মাণের জন্য মোজাইক পাথর আসে। সেই পাথর দিয়ে অ্যাকেনের বিশাল ও মনোরম রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়। তাঁর পরিকল্পিত গীর্জাটিও অপূর্ব সুন্দর।

সারা ইউরোপে অজ্ঞানতার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অন্ধকার যুগে শার্লেমেন জ্বালিয়েছিলেন সংস্কৃতির আলো। তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। লিখতে তিনি কোনদিন শেখেননি। তবে ক্রমে গ্রীক, ল্যাটিন ভাষায় লেখা বই পড়তে শেখেন। রাত্রে বালিশের নীচে তিনি লেখার জিনিষপত্র রেখে দিতেন। খেতে খেতে তিনি ইতিহাসের গল্প শুনতেন। সাম্রাজ্যে বিদ্যাচর্চার প্রসারের জন্য দেশবিদেশ থেকে তিনি বিখ্যাত পণ্ডিতদের এনেছিলেন। সেকালের ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এ্যালকুইনকে তিনি নিজের পরামর্শ-দাতা ও সভাপণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত করেন। শিক্ষাপ্রসারের জন্য তিনি সাম্রাজ্যে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ্যালকুইন ও ইতালি থেকে আগত অন্য পণ্ডিতদের এইসব বিদ্যালয়গুলি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেন। রাজপ্রাসাদের মধ্যে শার্লেমেন একটি বিদ্যালয় চালু করেন। সেখানে তাঁর ছেলেমেয়েরা পড়ত। সাম্রাজ্যের কোথাও প্রতিভাবান ছাত্রের সন্ধান পেলে তাকে তিনি রাজপ্রাসাদের বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ দিতেন। গীর্জা ও মঠগুলিতে বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিই ছিল সে যুগে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চাকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র পথ। শার্লেমেন এইজন্য হস্তলিপি শিল্পের প্রতি বিশেষ নজর দেন। সুন্দর হস্তাক্ষর পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে দেন। এইভাবে শার্লেমেন তাঁর সাম্রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়া গড়ে তোলেন।

খ্রীষ্টান মঠ ঃ মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ধর্মের অন্যতম কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছিল মঠগুলি। যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতেন এবং সাধারণতঃ বিদ্যাচর্চা ও ধর্মসাধনায় সম্পূর্ণভাবে ব্যাপৃত থাকতেন তাঁরা এই মঠগুলিতে বাস করতেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ দুইই ছিলেন। পুরুষদের বলা হতো মঙ্ক। তাদের মঠকে বলা হতো **মনাস্টারি**। সন্ন্যাসিনীদের বলা হতো নান। তাঁদের মঠকে বলা হতো **নানারি**। সন্ন্যাসীদের মঠের অধ্যক্ষকে বলা হতো 'এ্যাবট' বা 'প্রায়র'। সন্ন্যাসিনীদের মঠের অধ্যক্ষাকে বলা হতো 'এ্যাবস' বা 'প্রায়রেন'। এই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো **বেনিডিক্টিন, সিস্টারসিয়ান, কারথিউসিয়ান, ফ্রানসিস্‌কান ডামনিকান** প্রভৃতি।

কেউ সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করতে চাইলে আগে দু একবছর কোন মঠে থাকতে হতো। ঐ সময়ের পরেও যদি তিনি মঠে থাকতে ইচ্ছা করতেন, তাহলে তাঁকে বাকি জীবন ঐ মঠের নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। তাঁদের নিজস্ব বলতে সেখানে কিছুই থাকতনা।

মঠে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের চারধারে থাকত সন্ন্যাসীদের ঘর। মঠের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। সন্ন্যাসীদের গায়ে থাকত মোটা কাপড়। তা দড়ি দিয়ে শক্ত করে কোমরে জড়ানো থাকত। আহার ছিল অত্যন্ত সাধারণ। খাওয়ার সময় কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। সূর্য ওঠার বহু আগে উপাসনাগৃহে যেতে হতো। মঠে সকলকে খাটতে হতো। প্রয়োজনীয় সব জিনিস নিজেদের তৈরী করতে হতো। মঠের সীমানার বাইরে চাষ করা হতো। মঠের বাগানে শাকসব্জী ও ঔষধের লতাগুল্ম উৎপন্ন হতো। পশুপালন, রান্নাবান্না, কাপড়ধোয়া ও মঠ পরিষ্কার সবই তাঁদের নিজে হাতে করতে হতো।



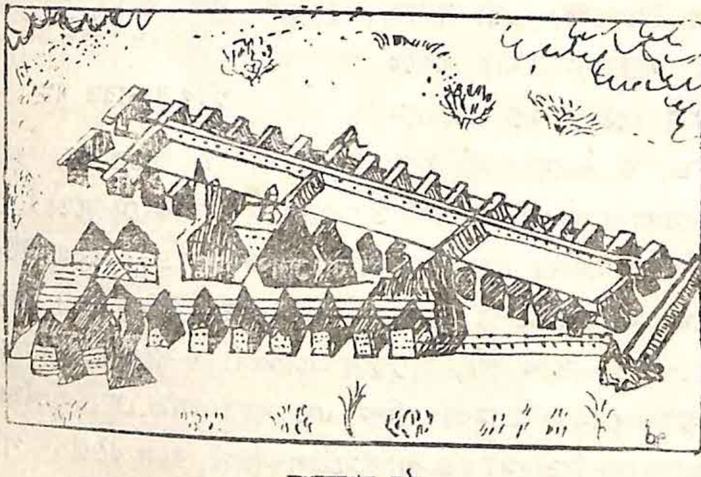
পুঁথি রচনারত মঙ্ক

মঠগুলি নগরের কোলাহল থেকে দূরে থাকত। তবুও ইউরোপের মধ্যযুগের জীবনের উপর মঠের গভীর প্রভাব পড়েছিল। মঠবাসীরা চারপাশের ক্ষুধার্তকে অন্ন, অসুস্থকে চিকিৎসা ও শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করতেন। তখনকার দিনে এত শহর আর হোটেল ছিল না। তাই পথিকদের বিশ্রামের জন্য প্রতি মঠে পৃথক ঘর রাখা হতো। পথিকগণ সেখানে ক্ষুধার অন্ন ও রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য শয্যা পেতেন।

মঠগুলি মধ্যযুগের সভ্যতার ধারক ও কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। মঠে মঠে ছিল বড় বড় পাঠাগার ও বিদ্যালয়। এই সব বিদ্যালয়ে সন্ন্যাসীগণ ছাত্রদের ল্যাটিনভাষা শিক্ষা দিতেন, পাণ্ডুলিপি লিখতেন, নকল করতেন। সন্ন্যাসীগণ নিজেদের জ্ঞান হাসিমুখে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন।

শিক্ষাবিস্তারের কাজে তাঁদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান হলো পুঁথি রচনা। চামড়ার উপর খোদাই করে তাঁরা পুঁথি রচনা ও নকল করতেন। এইভাবে তাঁরা প্রাচীন গ্রীক ও রোম সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু গ্রন্থের অনুলিপি করে রাখেন। নিজেরা লেখাপড়া শিখে উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মঠের সন্ন্যাসীগণ চারপাশের গ্রামের অজ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার করতেন।

সেণ্টবেনিডিক্টের শিক্ষা ঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে সন্ত বেনিডিক্ট যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে তোলেন সেটি ছিল সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত। বেনিডিক্টের নাম অনুসারে এটিকে বলা হতো **বেনিডিক্টন** সম্প্রদায়। সন্ন্যাসীদের আচার আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বেনিডিক্ট যে নির্দেশ দান করেন, সেগুলিকে বলে **বেনিডিক্টের নির্দেশ**। এই নির্দেশে বলা হয়েছে প্রতি সন্ন্যাসী কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলবে, নিয়মিতভাবে ধর্মীয় উপাসনায় যোগ দেবে। নৈতিক জীবনকে উন্নত ও সুগঠিত করে তুলতে হবে।



মধ্যযুগের মঠ

অশিক্ষিত ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে সুশিক্ষিত করে তোলা সন্ন্যাসীদের পবিত্র কর্তব্য। দুঃস্থ ও অসহায়দের সাহায্য করার উপরেও বেনিডিক্ট গুরুত্ব দেন। প্রতিটি মঠকে তিনি শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ কর্মস্থল রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি সক্রিয় প্রচেষ্টাও চালিয়েছিলেন।

সমাজসেবার উন্নত আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সন্ন্যাসীরা শিক্ষার প্রসারে

আত্মনিয়োগ করেন। সে যুগে শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল সীমাবদ্ধ। লিখতে, পড়তে ও বলতে পারাটাই ছিল তখনকার দিনে প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, গণিত, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হতো। শিক্ষার প্রধান মাধ্যম ছিল ল্যাটিন ভাষা। বেশীর ভাগ যাজক বা সন্ন্যাসী শুদ্ধ ও পবিত্র জীবনযাপন করতেন। মঠ এবং গীর্জাকে দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতেন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অধিকারের প্রশ্ন ঃ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সম্রাট এ দুয়ের মধ্যে কার ক্ষমতা ও মর্যাদা বেশী এ নিয়ে মধ্যযুগের ইউরোপে দীর্ঘকাল বিরোধ চলেছিল। রোম সম্রাট চাইছিলেন যে তিনিই পোপ হতে বিশপ পর্যন্ত সকলকেই মনোনীত করার একমাত্র অধিকারী। অন্যদিকে পোপ ঘোষণা করেন যে, তিনি শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই সর্বোচ্চ প্রধান নন— রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রেও তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে বিশপ ও এ্যাবটের মত রাজাকেও ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন। এই বিবাদের সূচনা হয় নবম শতকের গোড়ার দিতে। যেদিন সেণ্ট পিটার্স গীর্জায় রোমান পোপ শার্লেমেনের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন সেদিন থেকেই রোমান পোপদের ধারণা হয় ধর্মীয় প্রধান হিসেবে পোপের স্থান ও মর্যাদা রাজার উপরে। কিন্তু ইউরোপের সব রাজারা পোপের সর্বময় কর্তৃত্বের ইচ্ছা মেনে নিতে পারেননি। সেজন্যই দীর্ঘকাল সংগ্রাম চলে।

মধ্যযুগের ইউরোপে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ঃ মধ্যযুগের ইউরোপে প্রথমদিকে গীর্জাসংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হতো। সে শিক্ষা যথেষ্ট ছিল না। পরবর্তীকালে বড় বড় গীর্জাসংলগ্ন ক্যাথেড্রাল চার্চ স্কুল স্থাপিত হয়। এইসব স্কুলে সাহিত্য, গণিত, তর্কবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব এবং অল্পস্বল্প বিজ্ঞান পড়ানো হতো।

মধ্যযুগে উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য ছাত্রশিক্ষকের যৌথ উদ্যোগে এই মঠ ও গীর্জার স্কুলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানার শিক্ষানবিশগণের মত ছাত্রদের প্রায় ছ'বছর শিক্ষানবিশী করে শেষ উপাধি গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করতে হতো। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল সেলের্ণো। আইনশিক্ষার জন্য

বেলোনা, ধর্মশিক্ষার জন্য প্যারিস বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিল। মধ্যযুগের জার্মানীর হাইডেলবার্গ ও ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ।

মধ্যযুগে পণ্ডিতেরা জ্ঞানের রাজ্যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন তাঁদের বলা হতো স্কুল মেন বা স্কলাষ্টিকস। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবিলার্ড, এলবার্ট ম্যাগনাস, টমাস একুইনাস ও রোজার বেকন।

এবিলার্ড ব্রিটানির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি প্যারিসের নোটরডেম ক্যাথিড্রাল স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি বাইশ বছর বয়সে নিজেই শিক্ষকতা শুরু করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে নোটরডেম ক্যাথিড্রাল স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়। তাঁর রচিত একটি গ্রন্থের নাম 'হ্যাঁ এবং না'। কোন একটি বিষয়ের সপক্ষে ও বিপক্ষে পণ্ডিতেরা যা লিখেছেন তা শিক্ষার্থীদের বোঝানোর জন্য তিনি এই গ্রন্থকে দুভাগে সাজিয়েছেন।

এলবার্ট ম্যাগনাস ও তাঁর শিষ্য টমাস একুইনাস মধ্যযুগের পণ্ডিতগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। একুইনাস রচিত আঠারোটি গ্রন্থের মধ্যে 'সাম্মা থিয়োলাজিকা' মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্ববিদ্যার বিশ্বকোষ বলা যায়।

ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্ক : সেকালে উচ্চশিক্ষা লাভে ইচ্ছুক ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী ছাত্রাবাসে থাকত। এ কারণে ছাত্র ও শিক্ষকের সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশার সুযোগ ঘটতো। উভয়ের সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত। আবার বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রগণ পৃথক পৃথক ভাবে গড়ে তুলত এক একটি আঞ্চলিক সমিতি। এরূপ সমিতিকে বলা হতো জাতি (Nation)। যেমন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ছাত্রেরা একটি জাতি। স্পেনীয়রা আর একটি জাতি। এই শ্রেণীর জাতি গঠন করা সত্ত্বেও ছাত্রদের মধ্যে গভীর ঐক্যের সম্পর্ক বজায় থাকত। সকল জাতির ছাত্রদের পোষাক ছিল একরকম। ছাত্রেরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত তার সম্পর্কে গর্ববোধ করত। সমাজ জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ছিল অপরিসীম। কোন বিশেষ অধ্যাপকের ছাত্র হতে পারলে অনেকেই গর্ববোধ করত।

বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ে চর্চার অগ্রগতি : মধ্যযুগে ইউরোপের ভাষা ছিল ল্যাটিন। রোমান আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা জনপ্রিয় ছিল। ক্রমে ক্রমে ল্যাটিনের প্রাধান্যের যুগ শেষ হলো। বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হলো। রাজা আর্থার, রোল্যাণ্ড, রবিনহুড প্রভৃতি বীরপুরুষদের জীবনী অবলম্বন করে বহু গীতিকাব্য এবং রোম্যান্টিক সাহিত্য রচনা করা হয়। এইসব কাব্যসাহিত্যে এযুগের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইতালীর অমর কবি **দান্তের** নাম এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি **ডিভাইন কমেডি** নামক কাব্য রচনা করে একটি প্রাদেশিক ভাষাকে জাতীয় ভাষায় পরিণত করেন। তার কিছুকাল পরে ইংরেজ কবি **চসার 'ক্যান্টারবেরী টেলস্'** রচনা করে বিরাট খ্যাতিলাভ করেন। এই কাহিনীতে মধ্যযুগের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের শেষ দিকে যেমন জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ ঘটে তেমনি স্থাপত্যশিল্পেও নূতন নূতন বিকাশ ঘটে। এই স্থাপত্যশিল্প গথিক নামে আখ্যা পেয়েছিল। আর একটি স্থাপত্যশিল্পকে বলা হতো **রোমানেস্ক** শিল্প। গীর্জা নির্মাণের মধ্য দিয়েই এই শিল্পধারার প্রধান বিকাশ ঘটেছে। গথিক শিল্পের সঙ্গে গথদের কোন সম্পর্ক নেই। গথিক স্থাপত্যশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর সুদীর্ঘ চূড়া। চূড়াগুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হতে হতে যেন ঊর্ধ্বাকাশে চলে যায়। এই স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চার্টার, রীম্‌স্, প্যারিস, ক্যান্টারবেরী, কোলোন এবং মিলানের ক্যাথেড্রালগুলি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

সামন্ততন্ত্র : পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় তিনশতাব্দী সারা পশ্চিম ইউরোপে চরম বিশৃঙ্খলা চলে। শার্লামেন পুনরায় শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু শার্লেমেনের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে পুনরায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি

ঘটে। তার উপর মেগিয়ার, দিনেমার ও নর্মানদের আক্রমণে পুনরায় পশ্চিম ইউরোপে আগুন জ্বলে ওঠে। এইসব লুণ্ঠনকারীদের হাতে সাধারণ মানুষের দুর্গতির সীমা থাকে না। এই সকল আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার মত শক্তিশালী কোন রাজা তখন ছিলেন না। সাধারণ মানুষের



কৃষক জমিদার বিশপ ও যাজক

জীবন ও সম্পত্তি মোটেই নিরাপদ ছিলনা। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র ও দরিদ্র চাষীরা শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তাদের চেয়ে ধনী ও শক্তিশালী লোকদের সাহায্য চাইল। বিনিময়ে তাদের জমিজমা ঐ সকল শক্তিশালী ধনী লোকদের দিয়ে, তাদেরকে প্রভু বলে মেনে নিলো। প্রভুরাই সমস্ত জমির মালিক হয়ে উঠলেন। আর সকলে পরিণত হলো ভূমিহীন দাসে। জমির মালিকরা জমিগুলি চাষীদের মধ্যে শর্তসাপেক্ষে বিলি করলেন। প্রভুর জমি চাষের বিনিময়ে যুদ্ধের সময় সৈন্য হিসেবে কাজ করার দায়িত্বও কৃষকদের নিতে হলো। এই প্রথাকেই বলা হয় **সামন্ততন্ত্র** বা **ফিউডালিজম্**।

জমি নিয়ে মানুষে মানুষে চুক্তি ঃ ফিউডাল শব্দটি ফিউড শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ কাজের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ জমি। সামন্ত সমাজে সমস্ত শক্তি ও সম্পদের উৎস ছিল জমি। জমি আর জমির মালিককে আঁকড়ে ধরেই মানুষ গড়ে তুলেছিল এক একটি কেন্দ্র। রাজাই ছিলেন দেশের সকল জমির প্রথম ও প্রধান মালিক, রাষ্ট্রের কর্ণধার ও প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাজা রাজ্যের ভূসম্পত্তি বিলি করে দিতেন কয়েকজন

প্রধান সামন্তকে। এদের বলা হতো ডিউক বা আর্ল। প্রধান সামন্তরা আবার তাঁদের জমিগুলি বিলি করে দিতেন কতকগুলি ছোট সামন্ত বা উপসামন্তকে। এঁদের বলা হতো ব্যারনস্। এই উপসামন্ত বা ব্যারনস্‌রা জমিগুলি বিলি করে দিতেন অধঃস্তন লোকেদের মধ্যে, যাঁদের বলা হতো নাইট। এই নাইটরা তাঁদের উর্ধ্বতন ব্যারনদের প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেন ও অনুগত থাকতেন। আবার ব্যারন বা উপসামন্তকে সামন্ত বা ডিউকদের অনুগত ও বাধ্য থাকতে হতো। ডিউক বা সামন্তগণ রাজার নিকট শপথ নিতেন ও তাঁদের অনুগত থাকতেন। নাইটরা ছিলেন ধনী জমিদার। তাঁদের অধীনে থাকত অসংখ্য কৃষক। এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে জমি চুক্তির বিনিময়ে ভাগাভাগি হয়ে যেত। এই চুক্তি অনুযায়ী রাজা সরাসরি নাইটদের বা সামন্তরা সরাসরি কৃষকদের যুদ্ধের প্রয়োজনে ডাকতে পারতেন না। সব সময়ই একজন ঠিক তার অধঃস্তনের আনুগত্য চাইতে পারতেন। তবে এই সকল জমির মালিকরা সমস্ত জমিই বিলি করে দিতেন না। কিছু জমি নিজেদের দখলে রাখতেন। এই জমিতে ভূমিদাসদের বেগার খেটে চাষ করে দিতে হতো।

পুরোহিতের শাসন : মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের উপর যাজকরা দারুণ আধিপত্য বিস্তার করেন। যাজকদের প্রধান পোপ ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে ইউরোপের রাজা ও প্রজা সমস্ত শ্রেণীর মানুষের আনুগত্য পেতেন। ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে পোপ ইউরোপের সমস্ত খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতেন। তাঁরা এজন্য বহু 'ক্যানন ল' বা ধর্মীয় আইন তৈরী করেছিলেন।

মধ্যযুগে চার্চই ছিল সবচেয়ে বেশী জমির মালিক। কেউ ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য, কেউ আবার জনহিতকর কাজের জন্য চার্চকে জমি দান করত। রাজারা বিজিত রাজ্যের কিছু জমির মালিকানা চার্চকে দিয়ে দিতেন। এমনি করে নানাভাবে চার্চ এক বিশাল জমিদার হয়ে উঠেছিল। সামন্তযুগে যার যত জমি ছিল সেই ছিল তত ধনী। চার্চের এই জমিদারীর তত্ত্বাবধান করতেন চার্চের স্থানীয় প্রতিনিধিরা। চার্চ অনেক সময় সামন্তদের মধ্যে তাদের জমি বিলি করে দিত। আবার জমির মালিক হিসেবে চার্চ

ভূমিদাসও রাখত। চার্চ মালিকদের সঙ্গে ভূমিদাসদের সম্পর্ক ছিল প্রভু ভৃত্যের। একসময় ফরাসী দেশের এক বিশপ ভূমিদাসদের উপর দারুণ অত্যাচার করেন। তখন রাণী অত্যাচার বন্ধ করতে বলায় তিনি বলেছিলেন, তাঁর অধীনস্থ ভূমিদাসদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেলার অধিকারও তাঁর আছে। এই যুগের বিশপরা অনেকেই বিরাট ধনী, অত্যাচারী ও দুর্নীতি-পরায়ণ হতেন। তবে সমাজে শিক্ষিত সম্প্রদায় হিসেবে তাঁরা অনেক জনহিতকর কাজও করতেন।

সরকারী কর্মকর্তা সম্পর্কে ব্যক্তি ধারণা ঃ সামন্ত প্রথার অধীনে ইউরোপে বিভিন্ন আকারের সামন্তরাজ্য গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক সামন্ত প্রভুরাই নিজ নিজ রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের নিজেদের সৈন্যবাহিনী ছিল। তাঁর অধীনে বসবাসকারী সমস্ত কৃষককেই যুদ্ধের প্রয়োজনে কাজ করতে হতো। তাঁরা তাঁর রাজ্যের অধিবাসীদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন; অভিযুক্তদের বিচার করতেন। সাধারণ মানুষ তাদের অভাব অভিযোগ, সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে রাজার কাছে অভিযোগ করার কোন সুযোগই পেত না। তাদের সম্পূর্ণ ভাবে সামন্ত প্রভুর মর্জির উপর নির্ভরশীল থাকতে হতো। এজন্য সাধারণ মানুষের অবস্থা চরম দুর্দশায় পৌঁছেছিল। তারা কোন সুবিচার পেতনা। ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যই ছিল তাদের পাওনা।

এই ব্যবস্থার ফলে ইউরোপের সামন্ত রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক ঐক্য ও শক্ত কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে উঠতে পারেনি। অনেক সময় সামন্তরা এত শক্তিশালী হয়ে যেতেন যে রাজাকেও অস্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না। সাধারণ মানুষকে এই শাসনে অনেক বেশী দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হতো এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অনেক বেশী মূল্য দিতে হতো। তাই এই শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা মোটেই ভাল ছিলনা।

ইউরোপ রক্ষায় সামন্ত প্রাসাদ ও নাইটদের ভূমিকা ঃ সামন্ত যুগে ম্যানরের মাঝখানে থাকত জমিদারদের প্রাসাদ বা দুর্গ। এগুলো থাকত বেশ সুরক্ষিত জায়গায়। এই সকল প্রাসাদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য মজুত থাকত। সামন্ত প্রভুরা নিজ সন্তানদের প্রতিবেশী সামন্তের

রাজপ্রাসাদে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাতেন। এই ভাবে অন্য অভিজাত গৃহে শিক্ষানবিশী করে অভিজাতদের জীবন শুরু হতো। মধ্যযুগের প্রত্যেকটি সামন্ত প্রভুর প্রাসাদ বা ক্যাসলে অনেক অভিজাতবংশীয় ছেলেরা থাকত। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তাদেরকে পেজ (সাহায্যকারী) হিসেবে খাটতে হতো। প্রাসাদের মধ্যেই তারা ভবিষ্যৎ নাইট জীবনের সভ্যতা কর্তব্য ইত্যাদি শিক্ষা করতো। এরপর প্রাসাদের প্রভুদের দ্বারাই তাদের পদোন্নতি হতো। তারা তখন স্কোয়ার আখ্যা পেত। এরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে শিখত এবং নাইটদের ভারী বর্ম ব্যবহার অভ্যাস করত। পরে কুড়ি একুশ বছর বয়সে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা নাইট উপাধি লাভ করত। স্কোয়ার বা নাইটরা যুদ্ধে যেত এবং সব সময় বর্মসজ্জিত ঘোড়ায় তৈরী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বের হতো। এইসব নাইটরা দারুণ সাহসী ও শক্তিশালী যোদ্ধা হতো।

ইউরোপে সামন্ত প্রথার প্রধান দায়িত্ব ছিল নিরাপত্তা রক্ষা করা। সামন্ত প্রভুরা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করতেন বলে বিনিময়ে সাধারণ মানুষকে তাদের হয়ে যুদ্ধ করতে হতো। যে কোন রকম যুদ্ধ ও আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রাজা তার সামন্তদের সৈন্য নিয়ে হাজির হতে বলতেন। ডিউকরা ব্যারনদের ও ব্যারনরা নাইটদের সৈন্য নিয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতেন। রাজার নিজস্ব কোন নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ছিলনা। তিনি দেশরক্ষার জন্য যে সৈন্য সংগ্রহ করতেন তাদের সামন্ত সৈন্য বলা হতো।

জমিদার ও নাইটরা বল্লম ও তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় যুদ্ধ করতেন। যুদ্ধের ঘোড়া ও অস্ত্র তাদের নিজেদের ছিল। এই সকল অস্ত্র লৌহ নির্মিত ও খুবই ভারী ছিল। নাইটরা যুদ্ধে যাওয়ার সময় যখন সশস্ত্র হয়ে সজ্জিত হতেন তখন তাদের দুতিনজন মিলে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিতে হতো।

নাইটরা বিশ্বস্ততা, সৌজন্য ও শৌর্য অতুলনীয় ছিলেন। তাঁরা যুদ্ধবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। সমস্ত রকম দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে রক্ষার জন্য নাইট ও জমিদারদের সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। নাইটরা এজন্য সব সময় লোহার বর্মে সারা দেহ আবৃত করে রাখতেন। ক্যাসল্ থেকে যে ঘোড়ায় তাঁরা বের হতেন তারও সারাদেহ বর্মে আবৃত থাকত। এইভাবে মধ্যযুগে সামন্ত প্রাসাদই সাধারণ মানুষের

সম্পত্তি ও জীবনরক্ষার দায়িত্ব পালন করত। এরাই ছিল সে যুগে ইউরোপের একমাত্র রক্ষক।

সামন্তজীবন ঃ সামন্তযুগের জীবনযাত্রা ছিল বড় বিচিত্র। সামন্তরা ম্যানরের মধ্যে নিজ নিজ প্রাসাদে বাস করতেন। এই ম্যানরগুলো এক একটা গ্রামের মত ছিল। প্রাসাদের বাইরে ছিল ভূমিদাসদের বাসস্থান। সামন্তদের প্রাসাদগুলি ছিল ছোটখাটো দুর্গের মত। প্রাসাদগুলো পাথরের তৈরী ও খুব জাঁকজমকপূর্ণ হতো। প্রাসাদের চারপাশে পরিখা কাটা থাকত। তাতে থাকত অস্থায়ী সেতু। তা ইচ্ছামত তুলে নেওয়া যেত। ভেতরে থাকত কয়েকখানা শোবার ঘর ও মাঝখানে একটা হল ঘর। মশাল জ্বেলে প্রাসাদ আলোকিত রাখা হতো।

সামন্ত প্রভুদের জীবনধারায় রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরের দেওয়ালে সুন্দর নক্সা করা পর্দা থাকত। সুন্দর আসবাবপত্র থাকত। মাঝে মাঝে বিরাট ভোজের আয়োজন হতো। হাস্যকৌতুক, নাচগান, কুস্তি কসরৎ ইত্যাদি সমাজে প্রচলিত ছিল। সামন্তরা পশমের মোটা পোশাক পরতেন। চেরী, আপেল, পেয়ারা প্রভৃতি ফল ও শসা, গাজর, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ প্রভৃতি সব্জী তাদের আহার্য সামগ্রী ছিল। মাছ মাংস খুব পাওয়া যেত। শুয়োর, ষাঁড়, হরিণ নানারকম পাখী আস্ত রান্না হতো। আঙ্গুল ও কাঠের চামচের সাহায্যে আহার করতো।

আমোদ প্রমোদের মধ্যে শিকার ছিল সামন্ত প্রভুদের মহাআনন্দের ব্যাপার। তাছাড়া **টুর্ণামেণ্ট** ছিল তাঁদের কাছে খুবই রোমাঞ্চকর। আগে থেকেই টুর্ণামেণ্টের খবর প্রচার করা হতো। সকলেই এতে অংশ নিতে পারত। এছাড়া নানা অস্ত্রচালনা প্রদর্শনীর খুবই প্রচলন ছিল। তীর ছোঁড়া অভ্যাস খুবই প্রয়োজন বলে বিবেচিত হতো।

শিভালরি ঃ শিভালরি মধ্যযুগের ইউরোপের একটি সামরিক সংগঠন। এই সংগঠনের সভ্যদের বলা হতো **নাইট**। শিভালরির আসল অর্থ অশ্বারোহী সৈন্যদল। কেবল অভিজাতশ্রেণীর লোকেরাই নাইট হতে পারত। নাইটরা ছিলেন শৌর্যে, বিশ্বস্ততায় ও সৌজন্যে অতুলনীয়। তাঁরা প্রতিজ্ঞায় অটল থাকতেন, নারী, শিশু ও অনাথদের রক্ষা করতেন। ন্যায় প্রতিষ্ঠায়

প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। নাইটদের ভদ্র, সাহসী, বীর, সত্যবাদী, সৎ, বিশ্বাসী পবিত্র, অতিথি, সেবা-পরায়ণ হওয়া একান্ত কর্তব্য ছিল। কালক্রমে নাইটদের এই গুণাবলীই ইংরাজীতে শিভালরি বলে খ্যাত হয়।


নাইট

একজন অভিজাতের নাইট হতে গেলে আগে মনুষ্যত্বের পরীক্ষা দিতে হতো। সাধারণ সৈন্যরাও পুরস্কার হিসেবে শিভালরিতে যোগ দিতে পারত।

ভাবী নাইটজীবনের গুণাবলীর শিক্ষা দেওয়া হতো সামন্ত প্রাসাদগুলিতে। সেখানে অভিজাত বালকেরা 'পেজ' 'স্কোয়ার' ইত্যাদি পর্যায় পার হয়ে নাইট হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতেন। নাইট উপাধি দেওয়ার জন্য একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতো। নাইট উপাধি লাভের পূর্ব রাত্রিতে ভাবী নাইটকে একাকী গীর্জার বেদীমূলে উপাসনা করতে হতো। বেদীর উপরে থাকত তাঁর ঢাল, তরবারি ও বর্শা। প্রভাতে যাজক এলে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে শপথ করতে হতো, "বীরত্ব ও সম্মানের মর্যাদা রক্ষায় জীবনপণ করলাম, ন্যায়ের রক্ষক, অন্যায়ের শাসক থাকব, নারীর মর্যাদা রক্ষা করব, শরণাগত দুর্বল ও দুঃখতাপে ক্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।"

নাইটরা এই শপথ পালনে সারাজীবন বদ্ধপরিকর থাকতেন; কোথাও এর ব্যতিক্রম হতে দিতেন না। সামন্তযুগে ইউরোপে যে বর্বরতার ছাপ ছিল শিভালরির মহৎ আদর্শের স্পর্শে তা অনেকাংশে দূরীভূত হয়ে সভ্যরূপ ধারণ করেছিল।

গীতিকবি বা ত্রুবেদর ঃ মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের ভাষায় একদল কবি কাব্য রচনা শুরু করেন। এঁরা এইসব ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। সাধারণ মানুষ যাতে পড়তে পারে সেজন্য তাঁরা মাতৃভাষায় কাব্য ও গান রচনা করতেন। তাঁরা চারণ কবিদের মত ঘুরে ঘুরে কবিতা ও গান গাইতেন। কিন্তু তাঁরা পেশাদার গায়ক বা কবি ছিলেন না। এঁরা সাধারণতঃ অভিজাতশ্রেণীর হতেন। এঁদের ফ্রান্সে 'ত্রুবেদর' ও জার্মানিতে 'মিনেসিংগার' বলা হতো।

এই কবিগণ বড় বড় বীর যোদ্ধাদের নিয়ে কাব্যগাথা ও গান রচনা করতেন। তাঁরা কখনও কখনও তাঁদের কবিতা আবৃত্তি ও গান গাইবার জন্য গায়ক ও বীণাবাদক ভাড়া করতেন। রাজসভা, সামন্তপ্রভুদের সভায় তাদের দিয়ে কবিতা আবৃত্তি ও গান করান হত। নাইটদের শিভালরি বা শৌর্যই ছিল তাঁদের কাব্য ও গানের প্রধান বিষয়। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের এই গান ও কাব্য খুব প্রিয় ছিল।

চসার এই ধরনের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংরাজী ভাষায় কাব্য রচনা করতেন। তিনি ক্যাণ্টারবেরি টেলস নামে ধারাবাহিক কাহিনী লেখেন। সেযুগে ইউরোপে চসারের এই কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। চসার গীতিকবিদের ভঙ্গীতে এই কাহিনী রচনা করেন। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষ, সামন্তপ্রভুদের গল্প বলে আনন্দ দিয়েছে।

এই গীতিকবিরা সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা ও স্থানীয় ভাষায় কাব্যরচনায় উৎসাহ দিতেন। তাঁরা ল্যাটিন ভাষার একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙ্গে ফেলেন। তাঁরা মনে করতেন কেবলমাত্র চার্চ বা মঠই জ্ঞানচর্চার একমাত্র অধিকারী নন। সাধারণ মানুষ স্থানীয় ভাষা ও মাতৃভাষায় অনেক সহজভাবে লিখতে পড়তে পারত। সাধারণ মানুষ ল্যাটিনকে বিদেশী ভাষার মত দেখত এবং নিজের ভাষার উন্নতিতে সচেষ্ট থাকত। এই চিন্তাধারাই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের ও জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটায়।

ম্যানর প্রথা ঃ

ম্যানর বা খামার বাটিকা পদ্ধতি ঃ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে চুক্তিবদ্ধ

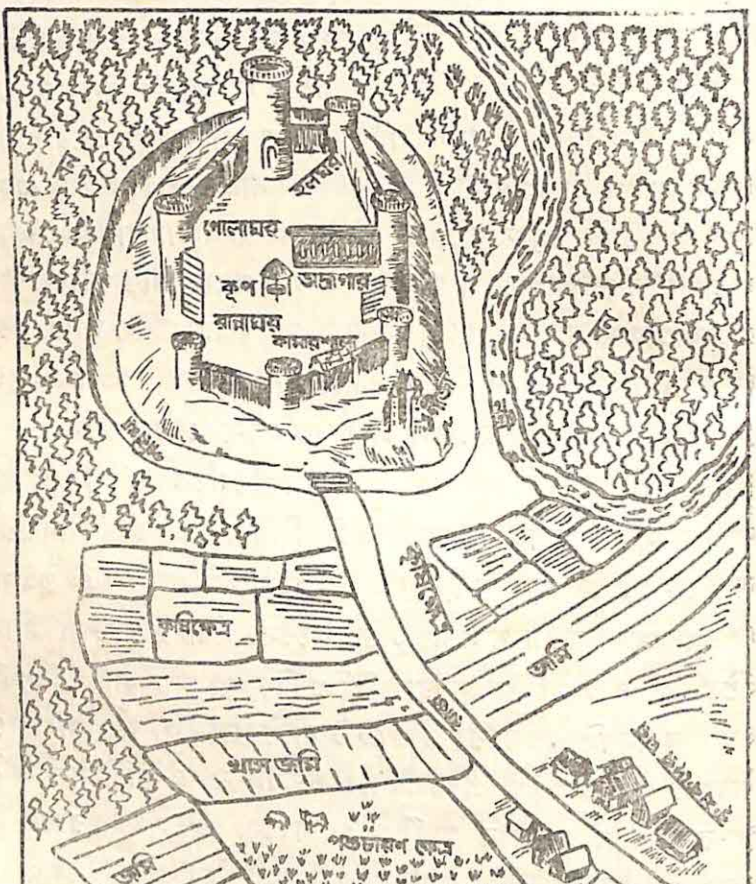
জমির মালিকানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত প্রভুরা তাদের নিম্নস্তরের কৃষক ও ভূমিদাসদের নিয়ে এক একটি গ্রাম গড়ে তুললেন। এই সকল গ্রামকেই বলা হতো 'ম্যানর'।

অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা এই খামার বাটি বা ম্যানরে বাস করতেন। ম্যানরে প্রকাণ্ড একটা ভোজনাগার থাকত এবং তার চার পাশে থাকত শয়ন কক্ষ। প্রস্তর নির্মিত এই সকল ম্যানর বা খামার বাটিই ছিল তাদের ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। সব দিক থেকে ম্যানরগুলি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। লবণ ও লোহার মত দুষ্প্রাপ্য জিনিষ ছাড়া সামন্তদের প্রয়োজনীয় সব জিনিষই ম্যানরে উৎপন্ন হতো। এক একজন সামন্ত বা জমিদারের একাধিক ম্যানর থাকত। উন্মুক্ত প্রান্তরে এই ম্যানর বা খামার বাটিকা তৈরী হলে তার চারপাশে পরিখা খনন করা হতো। আর গ্রামের শান্ত পরিবেশে হলে বিরাট কাঠের ম্যানর তৈরী হতো। ম্যানরগুলির দরজা ছিল ভারি লোহার তৈরী। ম্যানরগুলিতে মালিকরা পালাক্রমে বসবাস করতেন। একটি ম্যানরের খাদ্যশস্য শেষ হয়ে গেলে তাঁরা অন্য ম্যানরে চলে যেতেন।

ম্যানরবাসী সামন্তদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা ছিল প্রচুর। যখন বড় সামন্ত ছোট সামন্তকে জমি বিলি করতেন তখন বিনিময়ে তার কাছ থেকে পেতেন প্রচুর আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার। এই দুই সামন্ত তখন কতকগুলো কর্তব্য পালনের চুক্তি করতেন। খামার বাটি বা ম্যানরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন দিক এই চুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করা হতো। বড় মালিকের দায়িত্ব ছিল ছোট মালিককে রক্ষা করা আবার ছোট মালিকদের দায়িত্ব ছিল প্রভুর বিপদে সাহায্য করা ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য মজুদ রাখা এবং ম্যানরের আর্থিক প্রয়োজনের দিকে নজর রাখা। বড় সামন্ত শত্রুর হাতে বন্দী হলে ছোট সামন্তকে অর্থ দিয়ে প্রভুকে উদ্ধার করে আনতে হতো। আবার সামর্থ্য অনুযায়ী বড় সামন্তকে কর দিতে হতো। তাছাড়া নানা ধরনের সেলামী ব্যবস্থা ছিল। এই সকল নিয়মকানুন দ্বারা সামন্তদের তৈরী ম্যানর হাউসের বাসিন্দা সামন্তদের আর্থিক প্রয়োজন মিটতো।

ম্যানর বা খামার বাটিই শাসনের স্থানীয় শাখা ঃ সাধারণ কৃষক

ও ভূমিদাসদের দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের নিরাপত্তা, ম্যানরের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার সব দায়িত্বই ছিল ম্যানরের সামন্ত বা জমিদারদের ওপর। চুক্তি অনুযায়ী একজন সামন্তের অধীনস্থ লোকের উপরে তার উর্ধ্বতন সামন্তের খবরদারি করার কোন অধিকার ছিল না। তাই যে যার



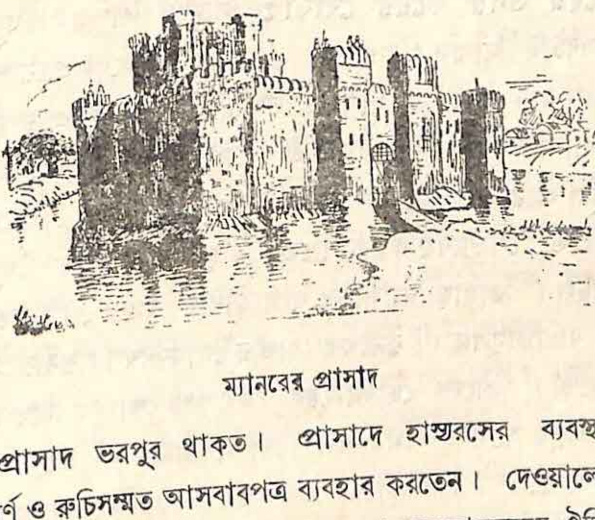
ম্যানর পরিকল্পনা

খামারের সর্বময় শাসক ও প্রভু ছিলেন। ম্যানরের মালিক সকল সামন্তেরই সৈন্য থাকত। তারা ম্যানর রক্ষায় নিযুক্ত থাকত। দেশের রাজা সর্বোচ্চ

শাসক হলেও রাজার সঙ্গে কেবলমাত্র সামন্তদের সম্পর্ক থাকত। তাদের অনুগত রাখার দায়িত্ব ছিল রাজার। তাই খামার বাটিগুলোর শাসন ব্যবস্থায় সরাসরি রাজার কোন অধিকারই ছিল না। সামন্তরা খামারের প্রয়োজনীয় সকল নিয়ম কানুনই নিজেরা তৈরী করতেন।

সামন্তরা নিজেদের আইন মত বিচারও করতেন। সামান্য অপরাধের জন্য কৃষকদের কড়া রকম জরিমানা দিতে হতো। সে টাকা যেত সামন্তদের তহবিলে। বাসিন্দারা এ ব্যাপারে রাজা বা তার প্রভুর উর্ধ্বতন সামন্তকে কিছুই বলতে পারতনা। তাই সামন্তরা নিজেদের ইচ্ছামত শাসন ও অত্যাচার করতে পারত।

ম্যানরের প্রাসাদ : ম্যানরের মাঝখানে থাকত অভিজাতদের প্রাসাদ বা সুরক্ষিত দুর্গ। প্রাসাদগুলি ছিল বিলাসবহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ। মশালের আলো বা মোমের আলো দিয়ে প্রাসাদ আলোকিত করা হতো। দরবারের সাজসজ্জায় সকলের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। সব সময় আমোদ



ম্যানরের প্রাসাদ

উল্লাসে প্রাসাদ ভরপুর থাকত। প্রাসাদে হাস্যরসের ব্যবস্থা থাকত। আড়ম্বরপূর্ণ ও রুচিসম্মত আসবাবপত্র ব্যবহার করতেন। দেওয়ালে নক্সাকাটা পর্দা ঝুলত। প্রাসাদের জাঁকজমক ও আড়ম্বর সামন্তদের ঐতিহ্য প্রকাশ করত।

অর্থনৈতিক অবস্থা : ম্যানরকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকার আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে উঠে। কারণ ম্যানরের প্রয়োজনীয় সব কিছুই ওখানে তৈরি

হতো। খাদ্যশস্য আসত জমি চাষ করে। মাংসের প্রয়োজন মিটত পশুপালন করে। কাপড় তৈরী করে, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে, মাঠ থেকে ফসল তুলে জমিদার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েও অনেকে জীবিকা নির্বাহ করত। এইভাবে এক একটি ম্যানর প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক সমাজের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু ম্যানরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমাজের একটা করুণ দিক আছে। সে কথা বলতে গেলেই কৃষকদের কথা এসে পড়ে। এরাই ছিল সব কিছুর উৎস। এই সকল কাজ কেবলমাত্র কৃষকরাই করত। কৃষকদের বাড়ীর মেয়েদেরও কাজ করতে হতো। ঘর পরিষ্কার থেকে শুরু করে সূতা কাটা, কাপড় বোনা সবই করতে হতো। এজন্য সামন্তদের কোন খরচ হতো না। কারণ তার অধীনস্থ এই সকল কৃষকদের ভরণ পোষণের বিনিময়ে প্রভুদের এই সকল প্রয়োজন মেটাতে হতো। ফলে বিনা পারিশ্রমিকে সাধারণ মানুষের শ্রমের বিনিময়ে সামন্তদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই উৎপন্ন হত ম্যানরে।

চাষীদের উপর করের বোঝা : সামন্ত প্রভুরা উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ফসলের সবটাই আত্মসাৎ করতেন। এমনকি কৃষকদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করতেন না। কৃষকরা যা কিছু উৎপন্ন করত সবই প্রায় দিয়ে দিতে হতো ; যৎ সামান্য যা অবশিষ্ট থাকত তা দিয়েই তাদের জীবন নির্বাহ হতো। সামন্ত প্রভুরা বারে বারে করের পরিবর্তন করতেন। যখন যেভাবে তাঁদের প্রয়োজন হতো সেভাবেই কর চাপাতেন। ভূমিকরের সঙ্গে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন করও যুক্ত ছিল। তাছাড়া মালিকের খাস জমিতে বেগার খেটে দিতে হতো। বেগার ছিল বাধ্যতামূলক। কৃষকের বাড়ীর লোকসংখ্যা অনুযায়ী মাথাপিছু কর দিতে হতো। তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে অন্য কোথাও দিতে হলে তার জন্য সামন্ত প্রভুর অনুমতি লাগত এবং করের বিনিময়ে এই অনুমতি মিলত। পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের জন্য তাকে কর দিতে হতো। পয়সা দিয়ে মালিকের উনুনে রুটি সেঁকতে হতো, মনিবের চাকিতে গম ভাঙ্গাতে হতো। মালিকের মাড়াই কলে আঙ্গুর মাড়াই করে মদ তৈরী করাত। এমনি করে কৃষকদের উদ্বৃত্তের উপর উপরি পাওয়ার জুলুম চালাত সামন্ত প্রভুরা। এতে চাষীরা দিনে দিনে নিঃস্ব হতে থাকল। তাদের অর্থনৈতিক

দুরবস্থা চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল। তাদের দিনের পর দিন আহারই জুটত না। অথচ প্রভুর পাওনা দেবার সব ব্যবস্থা তাকে করতেই হতো। এই ব্যবস্থার ফলে চাষীদের দুরবস্থার সীমা পরিসীমা ছিল না।

তখনকার দিনে একটা প্রবাদ ছিল যে যাজকদের হাতেই স্বর্গ ও নরকের চাবিকাঠি। তাই সাধারণ মানুষ ভয়ে তাদের জমিজমা টাকা-কড়ি যাজকদের দিত। কৃষকরাও রেহাই পেত না। নরকে না গিয়ে স্বর্গে যাওতো যাজকদের প্রণামী দাও। তাই কৃষকরা নিজেরা না খেয়েও তাঁদের প্রণামী দিত। তাছাড়া পোপের নামে তাদের কাছ থেকে আয়ের এক দশমাংশ কর আদায় করত। শুধু ফসলের কর নিয়েই তারা সন্তুষ্ট হতেন না, গবাদি পশুর এক দশমাংশও চার্চকে দিতে হতো। এইভাবে যাজক সম্প্রদায় ও সামন্ত জমিদাররা গরীব কৃষকদের আরও গরীব হতে বাধ্য করে।

সামন্তসমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ঃ সামন্ততন্ত্রের সময় বিশেষ শ্রেণীবিভাগ তৈরী হয়েছিল। প্রত্যেকেই জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে নিজ নিজ শ্রেণীর আওতায় থাকত। সামন্তরা তাদের উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে জমি পেত। এই সামন্তরা নিজেরা চাষ করত না। তারা চাষী ও কৃষকদের মধ্যে তাদের জমিগুলি চাষের জন্য বিলি করে দিত। প্রত্যেক ম্যানর এলাকাতে একটি করে গীর্জাও থাকত। এই গীর্জাই ছিল ঐ এলাকার সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কেন্দ্র। এখানে থাকতেন একজন করে গ্রাম্য পুরোহিত। এটাই ছিল যাজকতন্ত্রের সর্বনিম্ন ধাপ। এঁরা গীর্জায় মানুষকে খ্রীষ্টের কথা শোনাতেন। সুতরাং অভিজাত বা জমিদারশ্রেণী, যাজক সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ এই তিন শ্রেণীর লোক নিয়ে ছিল ম্যানর সমাজ। এদের মধ্যে সাধারণ মানুষ বা কৃষকরা ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। কৃষকরাই ছিল সামন্ততন্ত্রের সর্বনিম্ন শ্রেণী। কৃষকদের মধ্যে আবার তিনটি বিভাগ ছিল।

(১) প্রথম শ্রেণীর কৃষকরা ছিল **স্বাধীন** কৃষক তারা তাদের প্রভুদের কাছ থেকে জমি পাওয়ার পর, সে জমিকে তাদের নিজেদের জমি হিসেবে গণ্য করতে পারত। বিনিময়ে তাদের প্রভুর জন্য কোন কাজ করতে হতো না, কেবলমাত্র খাজনা দিতে হতো।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষক হল **ভিলেন**। এই শ্রেণীর কৃষকদের জমির

উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ কর হিসেবে সামন্ত প্রভুকে দিতে হতো। তাদের বছরের নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন প্রভুর জমিতে কাজ করতে হতো। বছরের বাকি দিনগুলিতে সে স্বাধীন ভাবে সামন্ত প্রভুর কাছ থেকে পাওয়া জমির দেখাশুনা করতে পারত।

(৩) সামন্ত প্রথার তৃতীয় ও শেষ শ্রেণীর কৃষক হল সার্ফ। এরা ছিল ভূমিহীন **ভূমিদাস** শ্রেণী। তারা তাদের প্রভুর জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করত। মধ্যযুগে ভূমিদাসরা চাষ করে খাদ্য উৎপাদন করত, সমাজকে বাঁচিয়ে রাখত। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সব ব্যবস্থা ওলট পালট হয়ে যায়। এই সময় সমাজে শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। তখন মালিক শ্রেণী খাদ্য উৎপাদন ও বিভিন্ন কাজের জন্য ক্রীতদাসদের একফালি করে জমি বন্দোবস্ত করে দিতেন। প্রথমে এই জমিতে চাষীর বিশেষ অধিকার ছিল না; মালিক ইচ্ছে করলেই তা কেড়ে নিতে পারতেন। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা পাকাপাকি হয় এবং ঐ সকল জমি পাওয়া ক্রীতদাসরাই ভূমিদাস শ্রেণীতে উন্নতি হয়। আবার ঋণের দায়ে বহু স্বাধীন কৃষকও ভূমিদাসে পরিণত হয়। ভূমিদাসরা যদি জমির বিনিময়ে কাজ না করত বা পাওনা না মেটাত তাহলে তাকে ম্যানর বা গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। তারা কখনই ইচ্ছামত প্রভু পরিবর্তন করতে পারত না। তবে ক্রীতদাস অপেক্ষা এদের অবস্থা অনেক উন্নত ছিল। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে পারলে তার জমির অধিকার বজায় থাকত। এমন কি প্রভু তার জমি অন্য মালিককে বিক্রি করে দিলে ভূমিদাসসহ জমি বিক্রি করতে হত। ফলে ভূমিদাসের নূতন প্রভু হতো কিন্তু মালিকানা বজায় থাকত। তারা প্রতিশ্রুতি মত কাজ করলে স্বপরিবারে একই জায়গায় বাস করতে ও একই জমি চাষ করতে পারত। ভূমিদাসদের কাছ থেকে প্রভুদের পাওনার সীমা পরিসীমা ছিলনা। সামান্য জমির বিনিময়ে সপ্তাহে অন্ততঃ তিনদিন তাকে প্রভুর জমিতে কাজ করে দিতে হতো। পাল-পার্বনের সময় নিজের জমির ফসল ও পোষা হাঁস মুরগী প্রভুকে ভেট দিতে হতো।

সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস সম্প্রদায়ের আর্থিক ও সামাজিক তফাৎ থাকলেও

তারা সকলেই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিল। কোন সামন্ত সন্তান কৃষকের কন্যাকে বিয়ে করতে পারতনা আবার কৃষকরাও কন্যাদের সামন্ত সন্তানদের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারত না। কোন সামাজিক আচার অনুষ্ঠান কিংবা উৎসবে সাধারণ কৃষকদের জন্য নির্ধারিত আলাদা জায়গা থাকত। সেখানে কোন সামন্ত প্রভু বসতেন না। সামন্ত শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মধ্যেও এই ব্যবধান বজায় ছিল। তাই মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় কোন উন্নতি ঘটেনি। সাধারণ কৃষকরা নিরক্ষর ছিল।

খড়ের চাল ঢাকা ছোট ছোট বাড়ীতে ভূমিদাসরা বাস করত। এই সকল বাড়ীতে একটা কি দুটো ঘর থাকত, জানালা থাকত না, মেঝে হতো মাটির। ঘরে আসবাবপত্র প্রায় কিছুই থাকত না।

কৃষকদের পরনে থাকত দড়ির বেল্ট দিয়ে বাঁধা মোটা জামা কাপড়। নিজেদের ভেড়ার লোম দিয়ে তারা কাপড় বুনে পরত। গায়ে কাপড় জড়িয়ে শীত নিবারণ করত। জুতোর বদলে পায়ের তলায় কাপড় জড়িয়ে রাখত। তাদের খাদ্যও ছিল অতি নিকৃষ্ট ধরনের। ডাল, শুকরের নোনা মাংস আর কালো রুটি ছিল খাদ্য। বেশীর ভাগ সময়েই তাদের শাক সেদ্ধ খেয়েই দিন কাটত। কৃষকদের সম্পত্তি বলতে ছিল কয়েকটি শুকর, একটা গাড়ী, কয়েকটা বলদ আর কোন কোন ক্ষেত্রে একটা ঘোড়া।

সন্ধ্যা হলেই তাদের আর কিছু করার থাকত না ; তারা শুয়ে পড়ত। তাদের ঘর বাড়ী খুবই নোংরা ছিল। শোনা যায় ভূমিদাসদের শরীর থেকে এত দুর্গন্ধ বের হত যে তাদের পাশে দাঁড়ানো যেত না। সাদা রুটি ও মুরগীর মাংস খাওয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

মনিবের চোখে ভূমিদাসরা জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে উন্নতস্তরের ছিলনা। ফরাসী দেশে একবার একজন ভূমিদাসের মূল্য উঠেছিল ১ টাকা ১৯ পয়সা আর একটা ঘোড়ার দাম ছিল ৩ টাকা ১২ পয়সা।

ভূমিদাসদের জীবনে আমোদ-প্রমোদ বলে কিছু ছিলনা বললেই চলে। কখনও কখনও এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের কুস্তি লাঠি খেলা হতো। কৃষকদের নিরানন্দ জীবনে একমাত্র গীর্জাই কিঞ্চিৎ আনন্দ এনে দিত। গীর্জাই ছিল তাদের আমোদ আহ্লাদের স্থান।

শহরমুখী কৃষক ঃ কৃষকদের অনেকেই কিছু কিছু শিল্পদ্রব্য তৈরী করত। কোন কোন শিল্পে এক একজন দক্ষতাও অর্জন করেছিল। সামন্ত-তন্ত্রের যুগেই চাষী কারিগরেরা তাদের তৈরী শিল্পদ্রব্য বড় বড় প্রাসাদ ও মঠের কাছাকাছি জায়গায় উৎসব ও মেলার দিন বিক্রি করত। এই বিক্রির অনুমতি সামন্ত প্রভুরাই দিতেন। তবে এই বেচাকেনা খুবই অনিশ্চিত ছিল ; ফলে কৃষকদের তৈরী শিল্প পণ্যরূপে গণ্য হতে পারে নি।

দক্ষ কারিগরদের তৈরী জিনিষপত্রেরও চাহিদা ছিলনা। তাছাড়া তারা বুঝতেও পারছিল যে, সামন্ত প্রভুরা তাদের শোষণ করে চলেছে। তাই তারা নিজেদের তৈরী জিনিষ যেখানে বিক্রি হবে তেমন জায়গায় যেতে প্রলুব্ধ হচ্ছিল। তাই এবার কিছু কিছু চাষী কারিগর ম্যানর ছেড়ে পালিয়ে গেল ; আবার অনেকে মনিবকে অর্থ দেবে এই শর্তে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। তারা যেখানে তাদের তৈরী জিনিষপত্র বিক্রি হবে এবং যেখানে কাঁচামাল পাওয়া যাবে তেমন নগরগুলিতে আশ্রয় নিল। এজন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা ছিল আর্চবিশপদের প্রাসাদ ও শাসনকেন্দ্রের কাছাকাছি স্থান। পলাতক এই সকল চাষী কারিগররা ও ভূমিদাসরা বড় বড় মঠ ও দুর্গের কাছে বসতি স্থাপন করল। অনেকে বাণিজ্য পথের চৌ মাথায় বণিকদের আগমন পথের কাছে বসতি গড়ল। ফলে তারা তাদের তৈরী জিনিষ বণিকদের বিক্রি করতে পারত। অনেকে আবার নানা ধরনের পণ্য বোঝাই ও খালাস করার কাজ করত।

কিন্তু অভিজাত প্রভুরা নগরের ব্যবসা বাণিজ্যেও অযথা হস্তক্ষেপ করতেন। নিজেদের জমির শেষ সীমায় তাঁরা টোল বসিয়ে দিতেন। ফলে বাইরে যেতে হলে কিংবা ভিতরে আসতে হলে ঐ সব টোলে শুল্ক দিতে হতো। তাই নগরের অধিবাসীরা এর থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিল। অবশেষে গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা চাষী কারিগররা একযোগে বিদ্রোহ করার জন্য তৈরী হতে লাগল।

কৃষক বিদ্রোহ ঃ ক্রমাগত শোষণ ও অত্যাচারের ফলে কৃষক সমাজ সামন্ত প্রভুদের উপর ক্রমশঃ বিরূপ হয়ে উঠছিল। ১৩৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মহামারীর পরেও জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যখন পার্লামেন্ট মজুরী

বাড়ালনা তখন তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলা। তাছাড়া পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়লে লোহা পুড়িয়ে কপালে দাগ দেওয়া হতে লাগল। অপর-দিকে যাজকরাও দেশজোড়া দারিদ্র্যের মধ্যে মহাসুখে বিলাসবহুল জীবন-যাপন করছিলেন। তাছাড়াও যুদ্ধের খরচের জন্য কৃষকদের উপর পলট্যাক্স বসান হল। ঠিক এই সময় জন ওয়াইক্লিফ নামক একজন ধর্মসংস্কারকের প্রচারের ফলে কৃষক ও শ্রমিকরা সামন্ত ও যাজকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে। তারপর ওয়াট টাইলার নামে আর একজন কেণ্ট জেলের কৃষকদের ক্ষেপিয়ে তোলেন। অবশেষে এই ওয়াটের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে লণ্ডনের দিকে এগিয়ে চলে। এই যুদ্ধে ওয়াট নিহত হন। অবশেষে পনের শতকের শেষভাগে কৃষকদের মুক্তি ঘটে।

ফ্রান্সেও ক্রমাগত কৃষক অসন্তোষ বিদ্রোহের রূপ নেয়। কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক, শাসক ও যাজকদের দুর্নীতি সমাজের কাছে তুলে ধরেন। এইভাবে এখানকার কৃষকরাও অভিজাত সামন্তদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়।

জার্মানিতে মার্টিন লুথার নামে একজন ধর্মসংস্কারক চার্চগুলির দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকল স্তরের মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। তখনকার পোপের নিয়ম অনুযায়ী মার্টিন লুথারকে সমাজচ্যুত ও ধর্মচ্যুত করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝতে শেখে যাজক ও শাসকরাই তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ ও শোষক। তাই কৃষকরা ক্রমশই ক্ষিপ্ত হতে থাকে। অবশেষে এখানেও কৃষক বিদ্রোহ ঘটে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেড

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য ঃ তোমরা অনেকেই শুনেছ যে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল প্যালেষ্টাইনের **বেথেলহেম** শহরে এবং মৃত্যু হয়েছিল জেরুজালেম শহরে। মুসলমানরা ৭ম শতাব্দীতে খ্রীষ্টীয় তীর্থভূমি

প্যালেষ্টাইন দখল করে। কিন্তু মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের ধর্মাচরণে কোন বাধা সৃষ্টি না করায় শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বজায় ছিল। একাদশ শতাব্দীতে তুর্কীরা আরবদের কাছ থেকে প্যালেষ্টাইন দখল করে নেয়। তুর্কীরাও ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তুর্কীরা খ্রীষ্টানদের ধর্মাচরণকে ভাল চোখে দেখতনা ও খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করত। তুর্কীদের রাজ্যবিস্তারে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটরা ভীত হয়ে উঠলেন। ইউরোপের সাধারণ মানুষও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের এই রাজ্যবিস্তারে খ্রীষ্ট জগতের ধর্মগুরু পোপ তাঁর একাধিপত্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। পোপ দ্বিতীয় আরবান সর্বপ্রথম পবিত্র তীর্থ জেরুজালেমকে মুক্ত করার জন্য সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজকে সকল ভেদাভেদ ভুলে যুদ্ধে যোগদান করার ডাক দেন। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শুরু হয়ে প্রায় ২০০ বছর এই যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধকেই বলা হয় **ক্রুসেড** বা ধর্মযুদ্ধ।



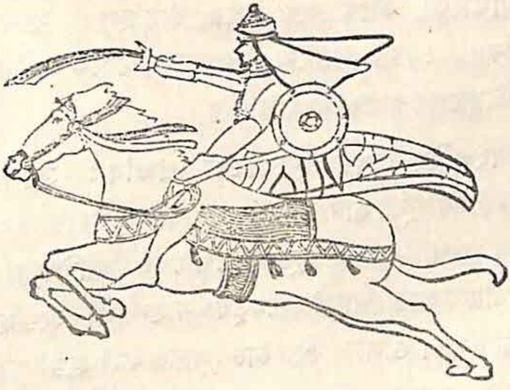
ক্রুসেডার

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেড ঃ ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আরবান ঘোষণা করেন ধর্মযুদ্ধ হোক, এইই ঈশ্বরের ইচ্ছা। শীঘ্রই সব খ্রীষ্টান দেশ ক্রুসেডের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করতে শুরু করে। ১০৯৫ থেকে ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছরের মধ্যে যাট বার ধর্মযুদ্ধ হয়। এদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেডই বিখ্যাত হয়ে আছে।

সংগঠিত কোন সৈন্যদল পুণ্যভূমি প্যালেষ্টাইনে পৌছানোর আগে যে ধর্মপ্রচারকরা ধর্মযুদ্ধে নেমেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ফরাসী সন্ন্যাসী পিটার। তাঁর ধর্মযুদ্ধ অভিযানই প্রথম ক্রুসেড নামে

খ্যাত। সন্ন্যাসী পিটারের আহ্বানে হাজার হাজার কৃষক ঘরবাড়ী ছেড়ে পথে লুঠপাট করতে করতে কনস্টান্টিনোপলে পৌছায়। সেখানেও তারা লুঠতরাজ শুরু করলে বাইজানটাইন সম্রাট তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন। তারপর নাইসিয়া আক্রমণ করলে তুর্কীরা তাদের প্রায় সকলকে হত্যা করে। সন্ন্যাসী পিটার ও অল্প কয়েকজন কোনরকমে প্রাণ বাঁচান। এইভাবে প্রথম ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটে।

১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় ক্রুসেডে ইউরোপের সংঘবদ্ধ রাজশক্তি যোগদান করে। এই তৃতীয় ক্রুসেডের নায়ক ছিলেন ইংল্যাণ্ডরাজ সিংহহৃদয় রিচার্ড, ফরাসী সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ ও জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা। এই তিন নেতা সৈন্যবাহিনীসহ তিনটি পথ ধরে জেরুজালেম অভিমুখে অগ্রসর হন। ফ্রেডারিক পথেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১১৯১



তুর্কীসম্রাট সালাউদ্দিন

খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপ রিচার্ডের সঙ্গে ক্রমাগত বিবাদ করে অবশেষে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। রিচার্ড একাই তৃতীয় ক্রুসেডের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রিচার্ড ছিলেন অসীম শক্তিশালী। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তির কাছে সব বাধাবিপত্তি তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। সাহস ও বীরত্বের জন্য তিনি সিংহহৃদয় আখ্যা পান। এই সময় তুর্কীদের সম্রাট ছিলেন সালাউদ্দিন। সালাউদ্দিন ছিলেন নিপুণ সেনাপতি, ক্ষমতাশীল, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ধর্মপ্রাণ সম্রাট। শত্রুর প্রতি উদারতা প্রদর্শন ছিল তাঁর চরিত্রের

বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধে রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে সালাউদ্দিন তাঁর জন্য জল, বরফ, ফলমূল প্রেরণ করেন। খ্রীষ্টানগণ নির্বিঘ্নে পুণ্যতীর্থ জেরুজালেম দর্শন করতে পারবেন সালাউদ্দিনের সঙ্গে এই চুক্তি করে রিচার্ড ফিরে যান।

চতুর্থ ক্রুসেডের উদ্যোগ নেওয়া হয় ফ্রান্সে। এতে রাজা তৃতীয় থিওবল্ড্, বল্‌ডুইন অফ্ ফ্লাণ্ডার্স ও কাউন্ট্ অফ্ শ্যাম্‌পেইন এই তিন নেতা অংশ নেন। চতুর্থ ক্রুসেড ১২০২ থেকে ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। এই ক্রুসেডের নেতাদের লক্ষ্য ছিল মুসলমানশক্তির কেন্দ্র মিশর দখল। কিন্তু তাঁরা সেই উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করেন ও ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে দখল করে নেন।

এইভাবে চতুর্থ ক্রুসেড ধর্মযুদ্ধ না হয়ে রাজ্য অধিকারের যুদ্ধে পরিণত হয়। মূল লক্ষ্য জেরুজালেম অধিকার করার চেয়ে নিজেদের অধিকার বাড়ানো ধর্মযোদ্ধাদের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল। ফলে চতুর্থ ক্রুসেড সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম থেকে খ্রীষ্টীয় প্রভাব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় ও ইউরোপের হাতছাড়া হয়ে যায়।

সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ক্রুসেডের প্রভাবঃ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে খ্রীষ্টানগণ জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করতে না পারলেও সমাজ ও সংস্কৃতি জগতে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ক্রুসেড পোপের আধিপত্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। খ্রীষ্টীয় জগতে পোপের নেতৃত্ব শক্তিশালী হয়েছিল। ধর্মযুদ্ধে নিহত বহু যোদ্ধার সম্পত্তি লাভ করে চার্চ আরও ধনী হয়ে ওঠে।

ধর্ম যুদ্ধের ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে গুরুত্ব পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বহু সামন্তপ্রভু ও নাইট নিজ জমিদারী ছেড়ে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে জমিদারীর আয় কমে যায় ও ঋণের ভারে দুর্বল হয়ে পড়ে। কোন কোন ভূসম্পত্তি ঋণের দায়ে ব্যবসায়ী ও বণিকদল ক্রয় করে নেন। এই ব্যবসায়ী ও বণিকদলের মধ্য থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী নামে এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ধর্ম যুদ্ধে যে সকল সামন্ত প্রভুদের মৃত্যু হয় তাঁদের ভূমিদাসরা মুক্ত হয়। সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা খর্ব হয়ে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ক্রুসেডের ফলে প্রাচ্যের দেশ ও জাতির সঙ্গে ইউরোপের চিন্তাজগতের

আদান প্রদান ঘটে। পশ্চিমী সভ্যতা প্রাচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। ক্রুসেডের ফলে ইউরোপবাসীরা আরবদের উচ্চতর সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। আরবদের জ্ঞান বিজ্ঞান ইউরোপের সভ্যতা সমৃদ্ধ করে। ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি জগতে বহু অগ্রগতি ঘটে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মুসলমান পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে গণিত বিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে নিজেদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি ঘটেছিল তা হল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার। দীর্ঘ কলহের মধ্য দিয়ে ক্রুসেডই পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে মিলন ঘটায়। এই যুদ্ধের ফলে খ্রীষ্টান যাজকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়।

নূতন শহর ও ব্যবসা কেন্দ্র স্থষ্টিতে ক্রুসেড (ইতালি) : ক্রুসেডের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যে জাহাজগুলি ধর্ম যোদ্ধাদের পবিত্রভূমিতে নিয়ে যেত সেগুলি প্রাচ্য থেকে বহু দ্রব্য ও বিলাস সামগ্রী নিয়ে ফিরে আসত। এই সকল দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য গড়ে উঠল নূতন নূতন ব্যবসা কেন্দ্র। প্রধানতঃ জলপথে বাণিজ্য চলত বলে সমুদ্র ও নদীর তীরে নূতন নূতন শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে ধর্ম যোদ্ধারা জেরুজালেম যাওয়ার জন্য যে বিভিন্ন পথ ব্যবহার করত সেগুলিই পরবর্তীকালে বাণিজ্য পথ হয়ে ওঠে। আরব বণিকরা এশিয়ার ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে দ্রব্যাদি নিয়ে এসে ইউরোপীয় বণিকদের নিকট বিক্রয় করত। এইভাবে রেশমবস্ত্র, মশলা, কার্পাস বস্ত্র, কার্পেট, সুগন্ধিদ্রব্য আরব ব্যবসায়ীদের মারফত ইউরোপের বাজারে পৌঁছুত। ক্রুসেডের ফলে ইউরোপে বিনিময় প্রথা শেষ হয়ে মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলন হয়।

ইটালির ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, নেপলস্ শহরগুলি শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। ভেনিসের নেতা ধর্ম যোদ্ধা ডগ ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়ে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করেন। কনস্টান্টিনোপল বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলে তিনি এই চক্রান্ত করেন।

কৃষি ছেড়ে কুটির শিল্পে : ক্রুসেড অভিযাত্রীরা প্রাচ্য দেশ থেকে

বহু নূতন কারিগরি বিদ্যা শিখে আসে। এগুলি তারা আগে জানত না। ইউরোপবাসীরা রেশম প্রস্তুত করার নিয়ম জেনে আসে। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য ধাতব দ্রব্যাদি প্রস্তুতে উন্নত পদ্ধতি, কাপড় প্রস্তুত করার উন্নত পদ্ধতি জেনে আসে। ফলে ইউরোপে কুটির শিল্পের অগ্রগতি ঘটে। তাছাড়া ক্রুসেডের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ঘটার ফলে শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তখন সামন্ত গ্রাম বা ম্যানর থেকে দক্ষ ও সাধারণ কারিগর সকলেই শহরের দিকে যাত্রা শুরু করে। এই কারিগররা পৃথক পৃথক কারিগরি পেশায় নিয়োজিত হয়। কৃষি ছেড়ে স্থায়ীভাবে কুটীর শিল্পকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে।

নবম পরিচ্ছেদ

শহরের উৎপত্তি

ক্রুসেডের ভূমিকা ঃ

শহরের উদ্ভব ঃ মধ্যযুগের প্রথম দিকে ইউরোপে শহর বলতে তেমন কিছুই ছিল না। ক্রমে যাতায়াতের পথে, ভাল রাস্তার মোড়ে ও নদীর তীরে ছোট ছোট গঞ্জ গড়ে ওঠে। ভ্রাম্যমাণ সওদাগরেরা ঐসব গঞ্জে বসে কেনা বেচা শুরু করে। অন্যদিকে মধ্যযুগে এক শ্রেণীর শ্রমিকের উৎপত্তি হয়েছিল। এরা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কাপড় বোনা, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, মাটির জিনিষ তৈরীর কাজ ইত্যাদি করত। মধ্যযুগের এই কারিগররা কুটির শিল্পে ধীরে ধীরে দক্ষ হয়ে উঠছিল। এই সব শ্রমিক ও বণিকদের উন্নতি হলে ও সংখ্যা বাড়লে সামন্তরা নিজেদের এলাকায় খানিকটা জায়গা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দিতো। ব্যবসায়ীদের বসতির ফলে এই জায়গাগুলো বেশ জনবহুল হয়ে উঠতো। এই পাঁচিল দেওয়া ঘেরা জায়গাকে বলা হতো বার্গ। ঐ বার্গগুলিতে বণিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ও ধীরে ধীরে বাণিজ্যের পুনর্জীবন লাভ ঘটল। এইভাবে

মধ্যযুগে শহরের উদ্ভব হয়। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে প্রাচ্যের দেশগুলির বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে শহরগুলির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। শহরবাসী বণিকরা নূতন ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগে ধনশালী হয়ে ওঠে, তাদের ক্ষমতাও বেড়ে যায়। বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান চাপে শহরের সংখ্যাও বেড়ে যায়। জল পথই ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন। এজন্য শহরগুলি প্রায়ই সমুদ্র বা নদীর তীরে গড়ে উঠলো। বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, মার্সেঈ, বার্সিলোনা, ভিয়েনা, ব্রিস্টল, লণ্ডন ইত্যাদি শহর প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

শহরের গিল্ড ব্যবস্থা ও তাদের ক্রিয়াকলাপ ঃ মধ্যযুগের গোড়ার দিকে ব্যবসায়ীরা কারিগর ও ব্যবসায়ী দুইই ছিল। তারা কেবলমাত্র দ্রব্য তৈরীই করত না, দোকানে বিক্রিও করত। বিভিন্ন শিল্পী কারিগরদের সংখ্যা বাড়লে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিলো। কালক্রমে কারিগররা কেবল মাত্র দ্রব্যাদি তৈরী করতে লাগল। ব্যবসায়ী বণিকরা তাদের কাছে সেই জিনিষপত্র কিনে নিতো তারপর সেগুলি অন্যত্র বিক্রয় করত। তারা দেশের একপ্রান্তের বাজারে জিনিষপত্র নিয়ে যেত। এইভাবে শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের দুটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল।

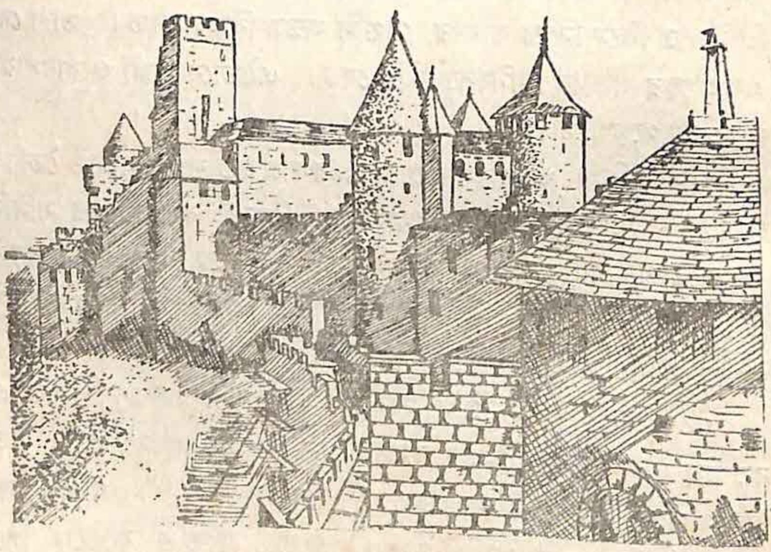
এইসব শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য শহরে সমিতি তৈরী করা হয়েছিল। এই সংঘগুলিকে বলা হতো গিল্ড। ব্যবসায়ীদের সমিতিকে বলা হতো ব্যবসায়ী গিল্ড। কারিগরদের সমিতিকে বলা হতো কারিগর গিল্ড। বিভিন্ন শিল্পের শিল্পীগণ ভিন্ন ভিন্ন গিল্ড গঠন করেছিল যেমন তন্তুবায় সমিতি, দর্জ্জি সমিতি, কর্মকার সমিতি ইত্যাদি।

এই গিল্ড বা সমিতিগুলি মধ্যযুগের ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গিল্ডগুলি কেবল ব্যবসায়ীদের স্বার্থই দেখতনা, গিল্ডের সভ্যরা জিনিষ পত্রের মান যাতে বজায় রাখে সেদিকে লক্ষ্য রাখত। খারাপ মানের জিনিষ তৈরী করলে শাস্তি হতো। গিল্ডের বর্হিভূর্ত কাউকে গিল্ডের বাজারে জিনিষ বিক্রি করতে দেওয়া হতো না। জিনিষ পত্রের মূল্য নির্দিষ্ট থাকত। কোন ব্যবসায়ী নির্ধারিত মূল্যের বেশীতে জিনিষ বিক্রি করলে

তার শাস্তি হতো। এই গিল্ডগুলি এত ভালভাবে কাজ করত যে তারা লীগ বা ইউনিয়ন তৈরী করেছিল। তারা বিভিন্ন স্থানে রাস্তাঘাট, পুল ইত্যাদি তৈরী করত।

কারিগরদের গিল্ডগুলি শ্রমিকদের মজুরী ঠিক করে দিত। একজন কারিগর কতজন মজুর রাখতে পারবে তার সীমাও বেঁধে দিতো। একজন দক্ষ কারিগর হতে গেলে তিনটি পর্যায় পার হতে হতো। সাত বছর বয়সের বালকরা ওস্তাদ কারিগরের কাছে শিক্ষানবিশী হয়ে ঢুকতো। তিন থেকে সাত বছর কাজ শেখার পর ওস্তাদ কারিগরের কাছে তারা কেবলমাত্র খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় পেত। তিন থেকে সাত বছর পর তারা জার্নিম্যান বা দিন মজুর বলে গণ্য হতো। জার্নিম্যান থেকে ওস্তাদ কারিগর হতে পারত। গিল্ডের আইন কানুন লঙ্ঘন করলে জরিমানা দিতে হতো।

শহর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ মধ্যযুগের শহরগুলির আয়তন ছিল ছোট। তার চারপাশে থাকত উঁচু পাথরের দেওয়াল। বড় বড়



মধ্যযুগের শহর

প্রবেশ দ্বারে দিন রাত প্রহরী পাহারা দিত। পথঘাট ছিল খুবই সংকীর্ণ।

শহরগুলি ছোট হলেও লোক সংখ্যা কম ছিলনা। যথেষ্ট লোকজন বাস করত। শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা মোটেই ভাল ছিলনা। কূয়ো থেকেই শহরে জল সরবরাহ হতো। শহরের রাস্তার দুদিকে ছিল খোলা নর্দমা। আবর্জনার স্তূপ ও নর্দমার দুর্গন্ধে চলাফেরা করা খুবই কঠিন ছিল। শহরের স্বাস্থ্য রক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিলনা। এছাড়া চোর ও দস্যুদের উৎপাত ছিল অত্যন্ত বেশী। রাস্তায় খুন জখম দাঙ্গা হাঙ্গামা মধ্যযুগের শহর জীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছিল। এর জন্যই শহরে পাহারা দিতে হতো। পান্থশালা, হাট বাজার, দোকান প্রভৃতির দ্বারা শহর সর্বদা সরগরম ও কোলাহলমুখর থাকত। এটাই ছিল নাগরিক জীবনের একটু স্বাচ্ছন্দ্য।

মধ্যযুগের গোড়ার দিকে শহরও সামন্ত প্রভুদের জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। শহরের অধিবাসীরা জীবন ও ধন সম্পত্তির নিরাপত্তার বিনিময়ে প্রভুকে কর দিতে বাধ্য ছিল। সামন্ত প্রভুর মনোনীত লোক শহরের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। এইসব সামন্ত প্রভুরা জমির শেষ সীমায় টোল বা মাশুল বসাতেন। শহর থেকে বাইরে যেতে হলে বা ভিতরে আসতে হলে ঐসব টোলে শুল্ক দিতে হতো। শহরের অধিবাসীরা এইরূপ নানা অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল।

রাজা কর্তৃক শহরের স্বায়ত্ব শাসন ঃ বেশীর ভাগ অভিজাত প্রভুর হাতে টাকা ছিল খুব কম। ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিলাসের ব্যয় বাড়লো। দেশের অর্থ ছিল বণিক ও সওদাগরদের কাছে। অর্থের প্রয়োজন হলে সামন্ত প্রভুরা নগরের বণিকের কাছে ধার নিতেন। ক্রমে টাকা ধার দেবার সময়ে বণিক গোষ্ঠী নিজেদের স্বাধীনতার সনদ আদায় করে নিতো। সেই সনদের চুক্তি অনুসারে তারা নিজেদের ইচ্ছামত শহরে শাসন, আইন কানুন, মুদ্রা প্রচলনের স্বাধীনতা লাভ করত। ক্রমে ঐ শহরকে কেন্দ্র করে বহু শক্তিশালী রাজ্য জন্ম নেয়। ইতালির ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জার্মানির মিউনিখ, নুরেনবুর্গ প্রভৃতি শহরে শক্তিশালী পরিবার রাজা হয়ে স্বাধীনভাবে শাসন শুরু করেন।

বুর্জোয়া কথার উৎস ঃ মধ্যযুগে কারিগর ও বণিকদের উন্নতি হলে সামন্তরা নিজ এলাকায় খানিকটা জায়গা উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে তাদের বাস

করার অনুমতি দিতো। ব্যবসায়ীদের বসতির ফলে সেখানে প্রচুর জনসমাগম হতো। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই বাসস্থানকে বলা হতো বুর্গ। আর সেখানকার অধিবাসীদের বলা হতো বার্গার। ঐ বার্গের ব্যবসায়ী ও বণিকশ্রেণী ধীরে ধীরে ক্ষমতাবান হয়ে রাজ শক্তিতে পরিণত হয়। এদের বলা হতো বুর্জোয়াশ্রেণী।

দশম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে দূরপ্রাচ্য—চীন ও জাপান

মধ্যযুগের চীন (৭ম—১৪শ শতক):

পৃথিবীর একদিকে যখন বর্বর জাতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য তছনছ হয়ে যাচ্ছে, দেশে দেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা রাজ্য বিস্তার করে চলেছে, সেই সময় প্রাচ্যের চীনদেশে জন্ম নিয়েছিল বিশাল সাম্রাজ্য। তোমরা আগেই জেনেছ মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র পৃথিবীর সর্বত্র একই ভাবে একই সময়ে জন্ম নেয়নি। চীনের ইতিহাস পড়লে সেটা আরও ভাল করে বুঝতে পারবে। চারদিকে ভাঙা গড়ার সীমানার বাইরে চীনে সম্পূর্ণ নূতন পথে সামন্ততন্ত্র বিকশিত হয়।

চীনের মধ্যযুগ শুরু হয় তাং বংশের রাজত্বকাল থেকে। ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাং বংশের সম্রাটরা রাজত্ব করেন। তাং বংশের এই তিনশত বছর রাজত্বকালে চীনের সমৃদ্ধি ঘটে। তাং রাজত্বের শেষ পঞ্চাশ বছরের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে শাং বংশীয়রা (৯৬০ খ্রীঃ—১২৭৯ খ্রীঃ) সিংহাসন অধিকার করেন। শাং আমলেও চীনা সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতি ঘটে। ত্রয়োদশ শতকে মোঙ্গলরা চীন জয় করে ইউয়ান নামে এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে।

চীনের সাধারণ মানুষের মনে রাজবংশ সম্পর্কে এক অলৌকিক ধারণা ছিল। রাজারাও অধিকাংশই ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু সভ্যতা সংস্কৃতিতে মধ্যযুগের চীন ছিল অতুলনীয়। মধ্যযুগে চীনেই প্রথম কাগজের ব্যবহার

প্রচলিত হয়। চীনারাই প্রথম মুদ্রা যন্ত্র ও মুদ্রণ শিল্প আবিষ্কার করেন। লোক গণনা প্রথাও চীনই প্রথম প্রবর্তন করে। মধ্যযুগে দেশ বিদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আদান প্রদান শুরু হয়। সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে চীন সভ্যতার যে সকল অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তার অধিকাংশই মধ্যযুগে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হয়েছিল। মহাপ্রাচীরের অন্তরালে লোক চক্ষুর অগোচরে যে বিচিত্র সভ্যতা সংস্কৃতি চীন গড়ে তুলেছিল তার গুরুত্ব সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে অসামান্য।

তাং বংশ ঃ

তাং বংশের রাজত্বকাল (৬১৮ খ্রীঃ—৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ)ঃ ভারতের হর্ষবর্ধনের যুগে চীনে রাজত্ব করতেন তাং বংশের রাজারা। তাং বংশের রাজত্বকালকে মধ্যযুগে চীনের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা যায়। তাং সম্রাটগণ প্রায় তিনশত বৎসরকাল চীনে রাজত্ব করেন। এই যুগে চীন খ্যাতি ও ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। চীন সাম্রাজ্যের সীমানা পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বতীর এবং পারস্য সীমানা থেকে আফগানিস্থানের অর্ধেক তারপর হিন্দুকুশ, তিব্বত পার হয়ে দক্ষিণ পূর্বে সুদূর কাম্বোডিয়া ও আনাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাং সম্রাটদের আমলেই চীনের এই আকার ধারণ করতে শুরু করে। এর থেকেই তোমরা অনুমান করতে পার সেই যুগেই চীন সাম্রাজ্য কত বিশাল ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী ও রাজকর্মচারীগণ সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন।

সুই বংশের পতন যখন আসন্ন, সেই সময়ে দেশব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে সম্রাটের সেনাপতি লি ইউয়ানের অভ্যুদয় হয়। সাত বৎসর নানা বিপদ অতিক্রম করে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন। পুত্র লি সি মিন-এর অসীম শৌর্য বীর্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্যই তাঁর এই অসামান্য সাফল্য সম্ভব হয়েছিল। এই হিসাবে তাং বংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা লি সি মিন। কিন্তু বংশের প্রথম সম্রাটরূপে ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন লি ইউয়্যান। ইতিহাসে ইনি কাও স্থ্ নামে পরিচিত। কাও স্থ চ্যাং আন নগরে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে কাও স্থ পুত্র লি সি মিন বা তাই স্থঙ্ এর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে অবসর গ্রহণ করেন।

তাং বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট হলেন তাই সুঙ্। তিনি তাতারদের বিতাড়িত করে সমগ্র চীনে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সুনিপণ সেনাপতি, সুদক্ষ শাসনকর্তা, শিল্প ও শিক্ষানুরাগী। তিনি ধর্মেও উদার মতাবলম্বী ছিলেন। জরথুষ্ট্রীয়, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের তিনি সমান সমাদর করতেন এবং সকলকেই তিনি চীনে নিজ নিজ ধর্মপালনের অনুমতি দেন। তাঁর অনুমোদনে মুসলমানরা ক্যাণ্টন বন্দরে যে মসজিদ নির্মাণ করেন তা আজও রয়েছে। এই সময়ে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই যুগেই বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারত ভ্রমণ করেন। তাছাড়া চীন সাম্রাজ্য ভারতীয় ও ইরানীয় সভ্যতার নিবিড় সংস্পর্শে আসে।

তাই সুঙ্-এর পর তাঁর পুত্র **কাও সুঙ্** ৬৪৯ খ্রীঃ থেকে ৬৮৩ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি সাম্রাজ্যের পরিধি আফগানিস্থানের আমু নদীর পরপারে ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কাও সুঙ্-এর পর বহুদিন চীনের শাসন ক্ষমতায় কোন উল্লেখযোগ্য সম্রাট ছিলেন না। অতঃপর ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে **সুয়ান সুঙ্** নামে একজন উল্লেখযোগ্য সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি মৃত্যুদণ্ড প্রথা রহিত করেন। সুয়ান সুঙ্ আদালত ও কারাগারে সংস্কারও করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন কবি; শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তাঁর এই সকল সর্বতোমুখী গুণের জন্য লোকে তাঁকে মিং হুয়াং বা সর্বগুণ-সম্পন্ন সম্রাট বলতো। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এই যুগে শিল্প সাহিত্যে প্রভূত উন্নতি হয়। তিনি ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি সাহিত্য পরিষদ গঠন করেন।

৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র **সু সুং** চীনের শাসন ক্ষমতায় আসেন। তারপর থেকে কয়েকজন দুর্বল সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁদের মধ্যে **টি সুং** ৭৭৯ খ্রীঃ থেকে ৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বাকিরা সকলেই দশ বৎসরের কম সময় রাজত্ব করেন। ৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর আরও সাতাশ বছর তাং বংশ নামে মাত্র শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে **চু ওয়েন** নামক জনৈক সেনাধ্যক্ষ শাসন ক্ষমতা দখল করেন এবং এই সঙ্গেই তাং-রাজত্বের অবসান ঘটে।

এইভাবে তাং বংশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে দেশের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট তাই সুঙ্-এর সময় সমগ্র চীন একতাবদ্ধ হয় এবং নূতন নূতন আইনকানুন তৈরী হয়। সম্রাট সুয়ান সুঙ্ বা মিং হুয়াং সমগ্র চীনের আইন কানুনকে নূতন করে বিধিবদ্ধ আকারে সংস্কার করেন। যেমন তিনি আইন করে মৃত্যুদণ্ড রদ করেছিলেন।

তাং বংশের শিক্ষা ঃ তাং বংশের সম্রাটরা বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ফলে তাঁদের আমলে চীনে শিক্ষার প্রসার ঘটে। চাকরি করতে গেলে পদ মর্যাদা অনুসারে পরীক্ষা দিতে হতো। এজন্যে রাজধানী চাং আন শহরে শিক্ষায়তন ছিল। তাই সুং-এর সময়ে এই কলেজে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮০০০ হাজার। চীনে কেবলমাত্র কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র বা কনফুসীয় সাহিত্যই শিক্ষার বিষয় ছিলনা, ইতিহাস, আইন, গণিত, পদ্য, লিখন শিল্প ও তাও-তত্ত্ব ছিল পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত। তাং আমলে গণিত জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তাও পন্থীরা 'সঞ্জীবনী রসায়ন' ও নানান ধরণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন। তাঁদের উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হলো চুম্বক ও কম্পাস।

তাংযুগকে বলা হয় কাব্যের স্বর্ণযুগ। কাব্যই ছিল এযুগের প্রধান সাহিত্য। তাংযুগের কাব্যসংগ্রহের দশটি গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থগুলিতে ৪২০০ কবি রচিত আটচল্লিশ হাজার কবিতা রয়েছে। এ থেকেই এ যুগের কাব্য সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। চীনের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি লি পো ও তুফু তাং আমলেই জন্ম গ্রহণ করেন। অন্যান্য কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেং হো-যান, পো চু-ই।

চা, মুদ্রণ শিল্প ও চিত্রাঙ্কণ ঃ চা-পান চীনের সমাজ জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। চা শব্দটিও চীনা। চা-পান নিয়ে বহু কাব্য সাহিত্য রচিত হয়। ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক কবি 'চা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে বহু কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, মুদ্রণ শিল্প তাং-যুগে আবিষ্কৃত হয়। তুন হুয়াং গুহা থেকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ছাপা গ্রন্থ উদ্ধার করা হয়েছে। ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বসাধারণকে বিতরণের জন্য কাঠের ব্লক থেকে এটি মুদ্রিত করা হয়।

তাং যুগে সুকুমার শিল্পেরও অনেক উন্নতি হয়েছিল। চীনারা চিত্রকে বলে 'মূক কাব্য'। চিত্রকে তারা কাব্যের সৌন্দর্য ও মর্যাদা দিয়েছে। বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা এমনকি কোন কোন সম্রাটও চিত্রাঙ্কণ বিদ্যার চর্চা করতেন। তাং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী উ তাও জু। তাঁকে চীনের র‍্যাফায়েল বলা হয়। তাং যুগে মৃৎ শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।



নক্সা করা মাটির পাত্র

তাং যুগে ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থা ঃ তাং বংশের রাজত্ব কালে চীন ব্যবসা বাণিজ্যেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। চীনা বণিকগণ ইন্দোচীন, মালয়, ভারত, পারস্য উপসাগর ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্যে যেতেন। বিদেশ থেকেও বহু আরব ও ভারতীয় বণিক চীন দেশে আসতেন। এই যুগে সর্বপ্রথম চীন দেশে রূপার মুদ্রা চালু হয়। বিদেশের বাজারে চীন দেশের কাগজ, সিল্ক, পোর্সিলিনের (চীনা বাসন) প্রচুর চাহিদা ছিল। তাছাড়া হাতির দাঁত, চন্দন কাঠ, ধূপ, তামা, গণ্ডারের শৃঙ্গ ইত্যাদি চীনে আমদানি হতো। চাং আন এই যুগের শ্রেষ্ঠ আমদানি রপ্তানীর কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল।

হোয়াং ও ইয়াং সি কিয়াং নদী উপত্যকার বাসিন্দাদের কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। তাং সম্রাটগণ জলনিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন। তার ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়ে যায়। কৃষক ও কৃষি উন্নয়নে সম্রাটগণ বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। খাজনার হারও খুব কম ছিল। এই যুগে কৃষকরা দুতিনবার ফসল ফলাতে পারত। চীনের শস্য বিদেশে বেশ চড়া দামেই বিক্রি হতো।

চীনে বৌদ্ধ ধর্ম ঃ বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর জলপথে ও স্থলপথে

মহাযান ও হীনযান দুই শাখাই চীনে প্রবেশ করে। মহাযান শাখাই চীনে প্রতিষ্ঠা পায়। হ্যান সম্রাট মিংতি দুজন বৌদ্ধ শ্রমণকে ভারত থেকে চীনে নিয়ে আসেন। এঁরাই প্রথম চীনা ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুবাদ করেন। চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভূত সম্মান ও সমাদর ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে দলে দলে মানুষ বৌদ্ধভিক্ষু হয়ে যেত। শক্তিশালী সম্রাটেরা এর কুফল উপলব্ধি করে ব্রতচারী মঠবাসীর সংখ্যা হ্রাসের চেষ্টা করেন। ৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট উ সুং-এর আদেশে বহু বৌদ্ধ মন্দির বিধ্বস্ত ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু তাং সম্রাটদের অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ফলে শীঘ্রই বৌদ্ধ ধর্মের পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হয়। রাজ সমর্থন লাভ করে এই ধর্ম সর্বোত্তম গৌরব লাভ করে। তাং যুগেই বৌদ্ধ শ্রমণ গণের শ্রেষ্ঠ অবদান রয়েছে।

জাপান, কোরিয়া ও আনামে চীন সভ্যতার প্রভাব : তাং যুগে চীনের ইতিহাস, চিন্তাভাবনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প জাপান, কোরিয়া ও আনামে বিস্তার লাভ করে। চীন থেকেই বৌদ্ধ ধর্ম এই দেশ গুলিতে প্রসারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম এই দেশগুলির জীবন্ যাত্রায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। এই দেশগুলির লিপি, পোষাক, সামাজিক আচার আচরণে সর্বত্র ছিল চীনের গভীর প্রভাব। চীনের শাসন ব্যবস্থাও জাপানে অনুসৃত হয়েছিল। এক কথায় চীনের প্রভাব এই দেশগুলির জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা যেত। চীন মহাপ্রাচীর বেষ্টিত থাকলেও সভ্যতা সংস্কৃতিতে চরম উন্নতি করে। লোকচক্ষুর অন্তরালেই যে বিশাল সভ্যতা তারা গড়ে তুলেছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যান্য সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিল ; অনেক ক্ষেত্রে তাদের অতিক্রম করে গিয়েছিল।

হিউয়েন সাঙ্-এর ভারত ভ্রমণ ও চীনে তার প্রভাব : তাং যুগের বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণে গমন করেন। তিনি সেখানে ধর্মশিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা, ও শাস্ত্র সংগ্রহ করেন। এইরূপে ষোল বছর ভারতে কাটানোর পর তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। জীবনের অবশিষ্ট কুড়ি বছর হিউয়েন সাঙ্ অধ্যাপনা ও ঐসব শাস্ত্র গ্রন্থের চীনা অনুবাদ করে কাটিয়ে দেন। হিউয়েন সাঙের অনূদিত গ্রন্থগুলি

বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলে। সেজন্য রাজসম্মানও তিনি পেয়েছিলেন প্রচুর।

সুঙ্ বংশের রাজত্বকাল ঃ

সুঙ্ বংশ (৯৬০ খ্রীঃ—১২৮০ খ্রীঃ) তাং বংশের পতনের পঞ্চাশ বৎসরকাল চীন সাম্রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা চলে। ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট **চাও কুয়াং ইন**। পরবর্তীকালে তিনি তাই জু নামে পরিচিত হন। বিনা রক্তপাতে তাই জু চীনের খণ্ডিত অংশগুলিকে একত্র করে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাই জু শাসন সংস্কার করে সারা দেশকে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন। তিনি আইন সংশোধন করেন। কারও প্রাণদণ্ড দিতে হলে সম্রাটের অনুমতি দরকার হবে এই নির্দেশ দেন। কনফুসীয় শাস্ত্র শিক্ষার প্রতি তিনি জোর দিয়েছিলেন। চাও কুয়াং ইন-এর পরবর্তী সম্রাট তাই সুং (৯৭৩—৯৯৮ খ্রীঃ)। তাই সুং-ও চীনের খণ্ড রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। সুং বংশের তৃতীয় সম্রাট চেন সুং (৯৯৮—১০১২ খ্রীঃ) ও চতুর্থ সম্রাট জেন সুং (১০২৩—১০৬৩ খ্রীঃ)। জেন সুং উত্তরাধিকারী মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করার পর সেন সুং-এর পুরোনো পন্থী রাজ কর্মচারীদের অপসারণ করেন। তিনি ওয়াং আন সিকে মন্ত্রী করেন। ওয়াং আন সি বহু জনহিতকর সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার করেন। সম্রাট সেন সুং ছিলেন আদর্শ চরিত্রের মানুষ, মিতাচারী ও ও বিলাস বর্জিত। তিনি রাজ দরবার থেকে বিলাসিতার সব দ্রব্য সরিয়ে দিয়েছিলেন। সেন সুং-এর পরবর্তীকালে সুঙ্ সম্রাটগণ সিরিয়া ও খিতান নামে দুটি খণ্ড জাতির উপদ্রবে বিব্রত হয়ে পড়েন। পরবর্তী সুঙ্ সম্রাট হই সুং-এর সঙ্গে কিন নেতা আকুতার বিরোধ বাধে। আকুতার নিকট পরাজিত হয়ে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুত্রকে সিংহাসন দিয়ে রাজধানী ছেড়ে চলে যান। এরপর সম্রাট কাও সুং লিং-আন-এ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় চীন দুখণ্ড হয়ে যায়। এক খণ্ডে কিন, অন্য খণ্ডে সুঙ্ রাজত্ব চলতে থাকে। তারপর মোঙ্গলরা চীন আক্রমণ করে ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী লিন আন বা হাং চৌ দখল করে নেয়। এরপরে সুঙ্ বংশের লোকেরা একটি শিশুকে

সম্রাটরূপে খাড়া করেছিলেন। এইভাবে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সুঙ্ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। এ বংশের রাজত্বকালের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন শিল্পী সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিকগণ, কোন সম্রাট নন।

বাণিজ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণঃ সুং আমলে জলপথে বাণিজ্য চলত। এই সামুদ্রিক বাণিজ্য বিদেশী বিশেষতঃ আরবদের হাতে ছিল। তারা ক্যান্টন, চুয়ান চৌ, হাং চৌ প্রভৃতি বন্দরে এসে বসবাস করত। এই বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন সরকার। তাঁরাই শুল্ক আদায় করতেন। চীনে প্রজাদের খাজনার ফসল রাজধানীতে পাঠানো হতো। অথচ দেশের ভিতরের অংশে খাদ্যের অভাবে ফসলের দাম যেত বেড়ে। মানুষের কষ্টের অন্ত থাকত না। ওয়াং আন সি প্রত্যেক জেলায় রাষ্ট্রের নিজস্ব শস্য-গোলা স্থাপন করেন। সেই গোলায় খাজনার ফসল মজুত রাখার ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজনমত সরকার গোলার শস্য অন্যত্র পাঠিয়ে বিক্রয় করতেন। এইভাবে বিভিন্ন স্থানের খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করা হতো।

রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষি ঋণ দানঃ সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বার্ষিক ৩৩·৩% সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা হয়েছিল। জমি বন্ধক রেখে কৃষক ঋণ গ্রহণ করত আর সেই ঋণ সে শস্য সংগ্রহের পর সুদসমেত পরিশোধ করত।

সম্পত্তি করঃ উর্বরতা অনুসারে জমিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল। ফসল কেমন হয় সেটাই বিচার করা হয়েছিল। অনুর্বর বা লোনাধরা জমি, পাহাড়, জঙ্গল মরুভূমি, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি করের আওতার বাইরে রাখা হয়।

সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চাঃ সুং যুগে বিদ্যাচর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে। মুদ্রণ শিল্প এক্ষেত্রে আরও সহায়ক হয়েছিল। সমালোচনা সাহিত্য ছাড়াও এযুগে কাব্য, প্রবন্ধ ইতিহাসের বই প্রচুর রচিত হয়। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক জু মা কুয়াং। সম্রাটের আদেশে তাই পিং ইউ লান নামে বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। কেবলমাত্র ইতিহাস কাব্যেই সুং প্রতিভা আবদ্ধ ছিলনা ; জ্যোতিবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, উদ্ভিদ বিদ্যা, গণিত শাস্ত্রেও বহু গ্রন্থ রচিত

হয়। ফলফুলের একখানি গ্রন্থে লেবু জাতীয় ফলের প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিক বিবরণ লিখিত আছে। সুং যুগের দর্শনচিন্তা সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটিয়েছিল।

সুং যুগের সাংস্কৃতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো চিত্রশিল্প। সুং যুগের খ্যাতি অতুলনীয় চিত্রশিল্পের জন্য। প্রাকৃতিক দৃশ্যই ছিল এইসব চিত্রশিল্পের প্রধান বিষয়বস্তু। সুং সম্রাট হুই সুং নিজে ছিলেন একজন কৃতী শিল্পী। চীন দেশে তিনিই প্রথম শিল্প আকাদামি স্থাপন করেন। এই আকাদামি উপাধি দান করত। সম্রাট স্বয়ং এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান করতেন। পোর্সিলিন শিল্পও সুং আমলে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে। সুং যুগের বসন ভূষণ, অঙ্গরাগ, মন্দির, গৃহসজ্জা সব কিছুতেই ছিল সংস্কৃতিসম্পন্ন মনের ছাপ। বস্ত্র বয়ন, ধাতু ও পাথরের কাজেও থাকত অনুপম শিল্প সৌন্দর্য।

মোঙ্গল জাতি ঃ মোঙ্গলরা হলো উত্তর পূর্ব এশিয়ার অধিবাসী এক যাযাবর জাতি। এরা ঘোড়ায় চড়ে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত। থাকত তাঁবুতে, খেত মাংস, ঘোড়ার দুধ ও দুধের তৈরী খাবার। পশুপালন, শিকার আর যুদ্ধ ছিল তাদের জীবিকা। মোঙ্গলরা প্রথমে ছিল দুর্বল। কিন জাতি তাদের উপর প্রভুত্ব করত। এই মোঙ্গলদের বংশে ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিসের জন্ম হয়। তিনি মোঙ্গলদের একটি দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত করেন। ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস কিনদের তাড়িয়ে দিয়ে উত্তর চীনের পিকিং দখল করেন। চেঙ্গিস উত্তর পূর্ব এশিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তিনি মধ্য এশিয়ার কাশগড় খোকন্দ, বোখারা প্রভৃতি বড় বড় শহর ছারখার করে সমরখন্দে পৌঁছান। তারপর রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে পৌঁছুলেন কৃষ্ণ সাগর তীরে। এইভাবে যেখানে গেছেন সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছেন। চেঙ্গিসের সাম্রাজ্য পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পশ্চিমে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওদগাই খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ওদগাই-এর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অশান্তি বাধে, অবশেষে ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গু খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মঙ্গু খাঁ তাঁর এক ভাই কুবলাই খাঁকে চীনের শাসনভার দেন। ক্রমশঃ সমগ্র চীন মোঙ্গলদের অধিকারে আসে।

ইউয়ান বংশ (১২৭৯-১৩৬৮) ঃ

কুবলাই খাঁ তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী পিকিং-এ স্থানান্তরিত করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশই চীনের বিখ্যাত **ইউয়ান বংশ**। কুবলাই প্রতিষ্ঠিত এই ইউয়ান বংশ মাত্র ৮৯ বৎসর চীনে রাজত্ব করে। কুবলাই খাঁর নিজে রাজত্ব করেন ১২৫৯ খ্রীঃ থেকে ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কুবলাই খাঁ বহু বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের সীমা অনেকখানি প্রসারিত করেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা ছিল দুর্বল ও স্বল্পায়ু। ১২৯৫ থেকে ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাতজন মোঙ্গল সম্রাট সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। সর্বশেষ মোঙ্গল সম্রাট সুস-তি। তাঁর রাজত্বকালে সাম্রাজ্য ভাঙনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলছিল। অবশেষে বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্য ১৩৬৮ সালে ধ্বংস হলো। কুবলাই প্রতিষ্ঠিত ইউয়ান বংশের রাজত্ব শেষ হয়ে গেল।

কুবলাই খাঁ ঃ কুবলাই খাঁ চীনে বিখ্যাত ইউয়ান বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর চীনা নাম সি সু। তাঁর শাসনকালকে বলা হয় 'মোঙ্গল শাসনের স্বর্ণযুগ'। কুবলাইয়ের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের আয়তন বহুদূর প্রসারিত হয়।



কুবলাই খাঁ

কুবলাই খাঁ শিক্ষালাভ করেছিলেন একজন চীনা পণ্ডিতের কাছে। শিক্ষার গুণে তাঁর রুচি মার্জিত হয়েছিল। মোঙ্গলদের অভ্যাস বর্জন করে চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

কুবলাই তাঁর পিতা ও পিতামহের মত তিব্বতী সামান পন্থী বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর পিতৃ পুরুষের আদিম সামান অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগবশতই কুবলাই মোঙ্গল লিখন পরিবর্তন করে তিব্বতী বর্ণমালার ধাঁচের লিখন প্রবর্তন করেন। এত বেশী বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হলেও তাঁর মধ্যে গোঁড়ামি ছিল না। তাঁর চরিত্রের প্রধান

গুণ ছিল পরধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণুতা। তিনি সকল ধর্মকে সমান সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন।

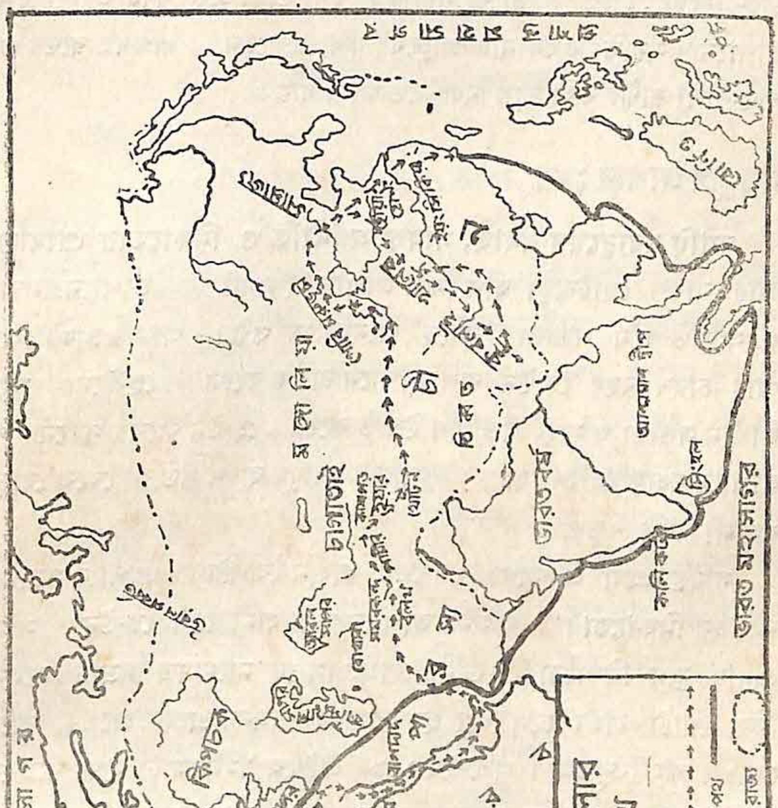
প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি কুবলাইয়ের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। একটি আকাদামি স্থাপন করে সেখানে বহু চীনা পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। কয়েকটি রাজপথ নির্মাণ করে ডাক চলাচলের সুব্যবস্থা করেন।

মার্কোপোলোর ভ্রমণ কাহিনী ঃ একবার ভেনিস শহরের দুজন বণিক ভ্রাতৃদ্বয় নিকোলো পোলো ও মাফিও পোলো ব্যবসা উপলক্ষে চীন-দেশে এসেছিলেন। তাঁরা কুবলাই খানের দরবারে গেলে তিনি তাঁদের মারফৎ কয়েকজন ধর্মপ্রচারক পাঠাতে পোপের নিকট অনুরোধ করেছিলেন। পোপ সে অনুরোধ সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারেননি। মাত্র দুজন সাধু সঙ্গে নিয়ে পোলো ভ্রাতৃদ্বয় চীন রওনা হন। এই যাত্রায় ভ্রাতুষ্পুত্র কিশোর মার্কোপোলোকে সঙ্গে নিয়ে পারস্য উপসাগর পার হয়ে পারস্য ও তারিম উপত্যকার পথে চীনের রাজধানী পিকিং-এ উপস্থিত হন।

মার্কোপোলো কুবলাই খাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি চীনদেশে একটি প্রদেশের শাসনকর্তা হয়ে প্রায় ১৭ বৎসর (১২৭৫ খ্রীঃ) কাটান। অবশেষে দেশে ফেরার সুযোগ এলো। মার্কোপোলো এক মোঙ্গল রাজ-কুমারীর বিয়েকে কেন্দ্র করে জলপথে পারস্যে পৌঁছান। পথে তাঁর সুমাত্রা ও দক্ষিণ ভারত পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। পারস্য থেকে স্থলপথে নিজের দেশ ভেনিসে আসেন। কিছুকাল যুদ্ধবন্দী হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সেখানে তিনি চীন ভ্রমণের যে বর্ণনা করেন তাই হলো "মার্কোপোলোর ভ্রমণ কথা"। তাঁর জনৈক সহচর এটা লিখে গেছেন। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

মার্কোপোলোর ভ্রমণকাহিনী থেকে সম্রাট কুবলাই খাঁ ও তাঁর সাম্রাজ্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে বলেন মোঙ্গল সম্রাটরা ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। বিশেষ করে কুবলাই খাঁর পিকিং রাজদরবারের দ্বার খোলা থাকত দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণীদের জন্য। তখন পিকিংয়ের নাম ছিল কাম্বালাক এবং উত্তর চীনের নাম ছিল ক্যাথ। চীন

ছিল প্রভূত সম্পদশালী দেশ। দেশের সর্বত্র ছিল সুন্দর সুন্দর বাগান, মাঠ, আঙুরের খামার। প্রতি রাস্তার ধারে ছিল সরাইখানা। ছোটবড় শহরগুলি মানুষের চলাফেরায় ও কাজকর্মে ব্যস্ত থাকত। নানা জায়গায় বহু বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠেছিল। রাজধানী ও রাজদরবার ছিল অত্যন্ত



জাঁকজমক পূর্ণ। শহরের চেয়েও মনোরম বারোটি অতি সুন্দর শহরতলি ছিল। সেখানে ছিল বণিকদের সুরম্য অট্টালিকা। আর শহরটিতে

দোকানপাট, পাকারাস্তা, চওড়া খাল, বহু সেতু, বড় বড় হাটবাজার, গুদাম, সাধারণের স্নানাগার ইত্যাদি ছিল। সোনারূপার কাজকরা কাপড় চীনদেশের ঐশ্বর্য ও শিল্পকলার পরিচয় দিতো। ব্রহ্মদেশ ভ্রমণকালে মার্কোপোলো বিশাল সৈন্যবাহিনী ও হস্তিবাহিনী দেখেছিলেন। ঐ হস্তিবাহিনী মোঙ্গল তীরন্দাজদের হাতে কিভাবে পরাজিত হয় তার এক বর্ণনাও দিয়েছেন। জাপানের সমৃদ্ধি ও সোনার প্রাচুর্যের কথা বলেছেন। দক্ষিণভারতের এক শক্তিশালী রাণীর কথা তার বিবরণীতে জানা যায়।

মধ্যযুগে জাপান ঃ

আদি মধ্যযুগের সমাজ, সামন্ত অর্থনীতি ও মিকাডোর প্রাধান্য ঃ প্রায় সাতশ ছোটবড়ো দ্বীপ নিয়ে জাপান দেশ গঠিত। জাপানের সমাজ ও সংস্কৃতি চীন সভ্যতার কাছে অনেকাংশে ঋণী। অষ্টম শতাব্দী থেকে প্রায় চারশ বছর হে-উন বংশ জাপানে রাজত্ব করেন। হে-উনের আমলে জাপান সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বেশ উন্নতি করে। হে-উন বংশের পতনের পর জাপানে মধ্যযুগের শুরু হয়। জাপানের মধ্যযুগ দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত।

সামন্ত প্রথা এ যুগের সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাপানে সম্রাটকে বলা হয় **মিকাডো**। এই সময় জাপানের রাজধানী ছিল হে-উন। সামন্ত প্রথার যুগে মিকাডো হে-উনের রাজপ্রাসাদে নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন। কিন্তু গোটা রাজ্য চলে গিয়েছিল সামরিক শাসনকর্তাদের হাতে। রাজ্যে চলছিল চরম বিশৃঙ্খলা। অবশেষে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'মিনামোটা ইয়োরিটোমো' নামে একজন বীর যোদ্ধা সকলকে পরাস্ত করে কামাকুরায় সামরিক শাসনের প্রবর্তন করেন। তিনি নিজেকে বলতেন **শোগান**। সামন্ততন্ত্রী জাপানে শোগানের শাসনই ছিল প্রধান।

জাপান সম্রাট অর্থাৎ মিকাডো দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্যই শক্তিশালী যোদ্ধাশ্রেণী নিজ নিজ অঞ্চলের জমিজমা দখলে এনে শাসন করতে থাকেন। এইভাবেই জাপানে সামন্তশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। কালক্রমে জাপানের সমাজে **সামুরাই, কৃষক, কারিগর ও বণিক** এই চারটি শ্রেণীর জন্ম হয়। কৃষক,

কারিগর ও বণিক ছিল জাপানের জনসাধারণ। সামুরাই শ্রেণীর সঙ্গে এই এই জনসাধারণের দূরত্ব ও পার্থক্য ছিল বহু। এমনকি পোশাক পরিচ্ছদেও এই পার্থক্য বজায় রাখা হতো।

সামুরাই শ্রেণী কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করতেন ও খাজনা আদায় করতেন। এই সামন্তশ্রেণী অর্থাৎ সামুরাই নিজ এলাকার জমিদারির আয় থেকে দুর্গ গড়তেন। এই সব দুর্গকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠত। এই শহরগুলি ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। ব্যবসাবাণিজ্য থেকেও সামুরাইগণই লাভবান হতেন।

মধ্যযুগের জাপানের শক্তিশালী যোদ্ধাগণ নিজ নিজ অঞ্চলের উপর শাসনকর্তৃত্ব কায়েম করলেও মিকাডোর সিংহাসনের দাবী কেউ করেননি বা জাপানের শাসনতন্ত্রের প্রধান হিসাবে তাঁকে মেনে নিতেও কেউ অস্বীকার করেননি। বংশ গৌরবে মিকাডো ছিলেন অত্যন্ত উচ্চে। তাছাড়া বিবাহ-সূত্রে বড় বড় পরিবারের সঙ্গে রাজপরিবারের যোগ ছিল। মিকাডোর বংশ সূর্যদেবীর পৌত্র থেকে উদ্ভূত এই সংস্কার ছিল জাপানের প্রত্যেকটি অধিবাসীর মধ্যে। মিকাডোকে তাঁরা দেবতা জ্ঞান করতেন। এই একটি কারণই মিকাডোর সম্মানের আসন অটুট রেখেছিল। প্রকৃত পক্ষে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করা ছাড়া এই সময়ে মিকাডোর কোন ভূমিকাই ছিলনা। সামন্তরা মিকাডোর নামে নিজ নিজ এলাকায় শাসন করতেন। সেজন্য তাঁরা মিকাডোর প্রতি মৌখিক সম্মান ও আনুগত্যও দেখাতেন।

মধ্যযুগে চীন ও জাপানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঃ জাপানের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বহু অংশে চীন সভ্যতার কাছে ঋণী ছিল। অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত চীন সর্বক্ষেত্রে জাপানের কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছিল। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোরিয়া ও চীন দেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকরা জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। জাপান থেকে বহু ছাত্র, বৌদ্ধ পুরোহিত, পণ্ডিত জ্ঞান আহরণের জন্য চীনে যান। কিন্তু নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে তারা মনে করে যে চীন সভ্যতার সকল ভাল জিনিষ তারা আয়ত্ব করেছে—এবার তারা নিজস্ব সভ্যতা গড়ে তুলবে। তাই চীনে জাপানের দূত পাঠানো বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু তখনও সরকারী নথিপত্র চীনা ভাষাতেই লেখা হতো। চীনা জিনিষ-পত্রেরও কদর ছিল। রাজসভাতেও চীনা রাজসভার আদবকায়দা মেনে চলা হতো। কিন্তু শিক্ষিত জাপানীরা আর চীন ভ্রমণ করতে যেতেন না। তবুও জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে চীন-জাপানের নিবিড় সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যেত। জাপানের ঘরেবাইরে ছিল এই সম্পর্কের গভীর স্পর্শ। জাপানের পোশাক পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, মূর্তিশিল্প চিত্রাঙ্কন সব কিছুতেই ছিল চীন সভ্যতার প্রভাব।

বৃহৎ পরিবারগুলির প্রতিরোধ ঃ জাপানে সামন্ত পরিবারদের মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত একটানা গৃহযুদ্ধ চলেছিল। সকলেই সবচেয়ে ক্ষমতাবান হতে চাইছিল। বহু গৃহ যুদ্ধের পর ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মিকাডোর অক্ষমতায় বিরক্ত হয়ে অনেক ধনী অভিজাত ব্যক্তি বৌদ্ধ সংঘে যোগ দেন। ফলে বৌদ্ধ সংঘগুলির প্রভাব বেড়ে যায়। অবশেষে কয়েকটি সামন্ত পরিবার এই বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **ওডা নোবুনাগা, টোয়িওটোমি-হিডোইয়োশি ও টোকু-গাওয়া-আইইয়েসু।** এই তিনজন সেনাপতি দেশব্যাপী অরাজকতা হানাহানি দূর করে জাপানকে ঐক্যবদ্ধ করেন। টোয়িওটোমি কৃষক সন্তান ছিলেন ও পরে দক্ষ সেনাপতি হন। এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি যে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন তা প্রায় ২৫০ বছর বজায় ছিল। নোবুনাগা ঘোষণা করেছিলেন সারা দেশে একজন মাত্র শাসক থাকবেন অসামান্য সামরিক দক্ষতা দিয়ে তিনি যখন অন্যান্য সামন্তদের প্রায় দমন করে এনেছেন তখন তাঁরই দলের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করেন। তারপর হিডোইয়োশি ১৫৯০ থেকে ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশ শাসন করেন। এরপর আইইয়েসু সমগ্র দেশকে সামরিক শাসনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করেন এবং এডোতে (বর্তমান টোকিও) রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর বংশের নাম অনুসারেই তাঁর শাসনকালের নাম হয় টোকুগাওয়া বংশের শাসনকাল।

মিকাডো শিন্টোধর্মের সর্বোচ্চ পুরোহিত ঃ প্রাচীনকাল থেকে জাপানীদের বিশ্বাস ছিল যে সূর্য.দবীর পৌত্র ছিলেন মিকাডোর অন্যতম পূর্বপুরুষ। বহু পূর্ব থেকে জাপানে **শিন্টোধর্ম** প্রচলিত ছিল। এই

ধর্মাবলম্বীরা পূর্বপুরুষ ও প্রকৃতির পূজা করত এবং মিকাডোকে দেবতার মত মনে করত। মিকাডো একদিকে ছিলেন দেশের সর্বোচ্চ শাসক, অন্যদিকে ছিলেন এই শিন্টোধর্মের প্রধান পুরোহিত। তিনি যাবতীয় ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করার একমাত্র অধিকারী ছিলেন। পরবর্তীকালে দেহ ও মনের পবিত্রতা রক্ষাই এই ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হয়।

ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বৌদ্ধদের প্রভাবে কেন্দ্রের ক্ষমতা হ্রাস : জাপানে টোকুগাওয়া বংশের শাসন প্রচলিত হওয়ার পরও মিকাডোর সিংহাসন পদ নিয়ে কোন টানাটানি হয়নি। কিন্তু ক্রমাগত টোকুগাওয়া শাসনতন্ত্রের প্রধানেরা দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হতে লাগলেন। তাঁরা সামরিক শাসন জারী করেন এবং সামরিক শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য হিডোইয়োশি প্রবর্তিত **'সোর্ড হাণ্ট'** বা অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকে আরো জোরদার করেন। অস্ত্র শস্ত্র গলিয়ে বুদ্ধের বিরাট মূর্তি গড়া হবে—এই প্রচার করে তাঁরা কৃষকদের সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র কেড়ে নেন।

এই সময়ে সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর জন্য আচরণবিধি রচিত হয়। সামুরাইরা ছিলেন জাপানের সামরিক শ্রেণী। সামুরাইদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমাজের অন্যান্য শ্রেণীদের সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি করা হলো। পোশাক পরিচ্ছদও অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে পৃথক করা হলো। তবে এই সময় জায়গীদার প্রথা লুপ্ত হয় ও সামুরাইদের বেতন দেবার প্রথা চালু হয়। বৌদ্ধ মঠগুলিকে থানায় পরিবর্তিত করা হয়। বৌদ্ধ মঠগুলি এখন থেকে জনসাধারণের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, স্থান পরিবর্তন সব কিছুর খোঁজ রাখত। এইসব নিয়ম যাতে ঠিক ঠিকভাবে পালিত হয় সেজন্য সারা দেশে গুপ্তচর ছড়িয়ে দেওয়া হতো। শাসনকার্য চালানোর জন্য দেশের এক চতুর্থাংশ জমির মালিক হন কর্তৃপক্ষ নিজে। তারই রাজস্ব থেকে শাসন ব্যবস্থার ব্যয় নির্বাহ হতো। সেজন্য কৃষির উন্নতিতে সরকার বিশেষ নজর দিতেন। সামন্ত প্রভুরা যাতে শক্তিশালী হয়ে বিদ্রোহ করতে না পারে এই ভয়ে টোকুগাওয়া শাসকরা দুর্গ ও যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ, টাঁকশাল স্থাপন বন্ধ করে দেন। এমন কি সামন্ত প্রভুদের এক বছর অন্তর রাজধানী এডোয় বসবাস

করা বাধ্যতামূলক হয় এবং জমিদারীতে থাকার সময় তাঁদের স্ত্রীপুত্রকে রাজধানীতে রেখে যেতে হতো। এইভাবে কয়েকটি অভিজাত বংশ এবং বৌদ্ধ সংঘগুলির প্রভাব বৃদ্ধির ফলে তাঁরাই প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং জাপানের রাজশক্তি নামে মাত্র ক্ষমতাসীন থাকে।

শোগানেট ঃ মধ্যযুগে শোগান ছিলেন শাসন বিভাগের সবার উপরে। শোগানদের শাসন ছিল সামরিক শাসন এঁদের শাসনকালকে বলা হয় শোগানেট বা শোগান আমল। শোগানদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন আইইয়েস্থ। তিনি এডোতে রাজধানী স্থাপন করেন। আইইয়েসু নিজেকে শোগান বলতেন বলেই তাঁর আমলকে শোগান আমল বলা হয়। সারা দেশে সামরিক শাসনই এই আমলের মূল বৈশিষ্ট্য।

সামুরাই ঃ জাপানের এক শ্রেণীর সামরিক গোষ্ঠীকে সামুরাই বলা হতো। বংশ গৌরবে এঁরা নীচু ছিলেন না। মধ্যযুগের প্রথম দিকে এঁরা সৈনিক জীবন যাপন করতেন। রাজসভার শোভা বৃদ্ধির চেয়ে সৈনিক জীবনকে এঁরা বেশী মূল্য দিতেন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের মূল্য এঁদের কাছে ছিলনা। অশ্ব আর বস্ত্র ছিল এঁদের নিত্য সঙ্গী। গোষ্ঠী প্রভুর প্রতি আনুগত্য এমন কি তাঁদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা ছিল সামুরাইদের জীবনের ধর্ম। তাঁরা একাধারে অশ্বারোহী তীরন্দাজ ও তরবারি চালক হতেন। নিজেকে অপমানিত মনে করলে তাঁরা নিজের পেট চিরে আত্মহত্যা করতেন।

জাপানের শিভালরি বা বুশিডো ঃ কোন কোন দিক থেকে সামুরাইকে মধ্যযুগের ইউরোপের নাইটের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তবে ইউরোপের শিভালরি এসেছিল খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাবে এবং নারীর সম্মান রক্ষা ছিল অন্যতম প্রধান আদর্শ। কিন্তু সামুরাইদের বীরত্বের আদর্শ এসেছিল গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সামরিক লড়াই থেকে। ধর্ম বা স্ত্রীজাতির কোন স্থান সেখানে ছিলনা। বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা নীতিও তাদের উপর প্রভাব ফেলেনি।

পরবর্তীকালে সামুরাই সম্প্রদায় অনেক মার্জিত হয়ে ওঠে। তবে তাদের সামরিক চরিত্র ও প্রভুর জন্য আত্মবিসর্জন কখনই তারা ত্যাগ করেননি।

সংক্ষেপে জাপানের সামরিক সম্প্রদায় সামুরাইদের শিভালরির বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হলো।

১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরিটোমোর সময় থেকে জাপানে সামরিক শাসন প্রচলিত হয়। সামুরাই সম্প্রদায় ছিল বলে তাদের মধ্যেও কিছু বিধি বিধান প্রবর্তিত হয়। টোকুগাওয়ার আমলে সেগুলি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এই বিধি বিধানগুলিকেই বলা হয় বুশিডো। বুশিডো অর্থ যোদ্ধার জীবন যাপন বিধি। সততা, সাহস, আনুগত্য, নিষ্ঠা, পরোপকার, আত্মসংযম, ও অর্থের প্রতি ঘৃণাই ছিল এর মূল আদর্শ। জাপানের সামরিক শাসন যাতে শিথিল না হয় সেজন্য শাসকরা সৈনিক সম্প্রদায়ভুক্ত সামুরাইদের জন্য এই বুশিডো বা বিশেষ জীবনধারার প্রবর্তন করেন। অনেক সময় সামুরাইগণ এই আদর্শ লঙ্ঘন করলেও শাসনব্যবস্থায় তাদের বেশ গুরুত্ব ছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের ভারতবর্ষ

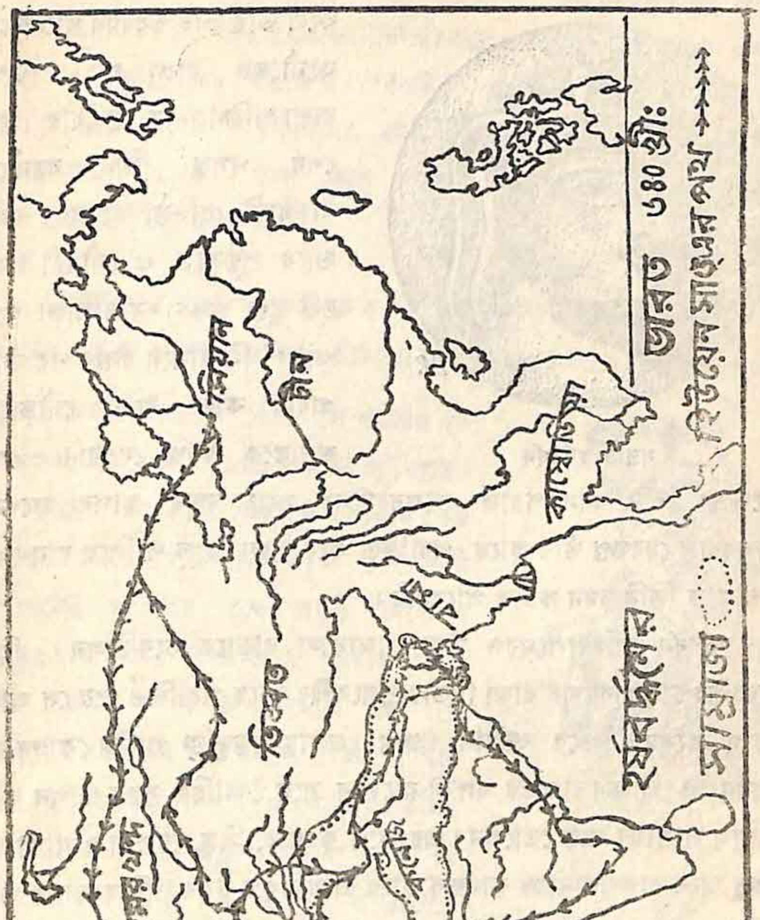
গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে হূণ আক্রমণ : ইউরোপে রোম সাম্রাজ্য যখন একটু একটু করে ধ্বসে পড়ছে তখন ভারতে গড়ে উঠছে এক বিশাল সাম্রাজ্য। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভারত রাজনৈতিক ঐক্য, সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈদেশিক সম্পর্ক সব দিক থেকে উন্নতি করে। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের মত গুপ্ত সাম্রাজ্যেও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ছিল। অন্যদিকে সাদা হূণরা প্রবল বিক্রমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর হূণগণ পারস্য ও কাবুল দখল করে দুর্বার গতিতে ভারতে প্রবেশ

করে। সাদা হূণদের দুজন দুর্ধর্ষ নেতা তোরমান ও মিহিরকুলের নাম উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম শতাব্দীর শেষে হূণ দলপতি **তোরমান** মালবের রাজা হয়ে বসেন। মিহিরকুল তাঁর পুত্র। নিষ্ঠুরতায় মিহিরকুল এ্যাটিলাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন করেন এবং মধ্যভারতের বেশ কিছু অংশ দখল করে নেন। গুপ্ত বংশের সম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য মিহিরকুলকে পরাজিত করেন কিন্তু হত্যা না করে মুক্তি দেন। পরে মিহিরকুল মধ্যভারতে প্রবেশের চেষ্টা করলে মালবের রাজা যশোবর্মণ ও গুপ্তসম্রাট বালাদিত্য তাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের পর হূণশক্তি প্রায় বিধ্বস্ত হয়। তখনও সাদা হূণরা একেবারে মিলিয়ে যায়নি। ছোটখাটো হূণনেতারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সামান্য অংশে রাজত্ব করতে থাকেন।

হূণ আক্রমণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ হূণ আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করে তার পতন দ্রুত করে দিয়েছিল। হূণ আক্রমণ প্রতিহত করতে দেশবাসী মালবরাজ যশোবর্মনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। সাদা হূণরা বিদেশী হলেও দীর্ঘকাল ভারতে থাকার ফলে ভারতীয় সভত্যা দ্বারা প্রবাবিত হয়। মিহিরকুল ছিলেন শিবের পরমভক্ত। ক্রমশঃ হূণরা ভারতীয়দের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে যে রাজপুতজাতির বীরত্বকাহিনী উত্তর ভারতে রোমাঞ্চকর ইতিহাস সৃষ্টি করে সম্ভবতঃ তারা হূণদের বংশধর। হূণ আক্রমণের সামাজিক কুফলও দেখা দেয়। হূণ আক্রমণে দেশব্যাপী যে অরাজকতার সৃষ্টি হয় তার ফলে হিন্দুধর্ম ও সমাজ আরও রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। জাতিভেদ প্রথা ও উচ্চজাতি ও নিম্নজাতির মধ্যে ভেদাভেদ বেড়ে ওঠে। ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান ধারক সামাজিক পরিবর্তনের ফলও সুদূর-প্রসারী হয়েছিল।

খণ্ডবিখণ্ড গুপ্তসাম্রাজ্য ও হর্ষবর্ধনের যুগের শুরু ঃ গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর মান্দাসোরে যশোবর্মন, উত্তরগাঙ্গেয় উপত্যকায় মৌখরী বংশ এবং পূর্বভারতে গৌড়-রাজ্যের উদ্ভব হয়। তারপর সপ্তম শতাব্দীতে পুষ্যভূতি বংশের রাজা **হর্ষবর্ধন** (৬০৬ খ্রীঃ) থানেশ্বরের সিংহাসনে

বসেন। এই সময় থেকে হর্ষাব্দ গণনা করা হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে মৌখরী বংশের শেষ রাজা গ্রহবর্মণ হর্ষবর্ধনের বোন রাজ্যশ্রীকে



বিয়ে করেন। গ্রহবর্মনের রাজধানী ছিল কনৌজ। কিন্তু কিছুদিন পরই গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধে এবং

গ্রহবর্মনের মৃত্যু হয়। ফলে কনৌজের সিংহাসন শূন্য হয়ে পড়ে। ঐ সংঘর্ষে থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের বড় ছেলে রাজ্যবর্ধনও নিহত হন। ফলে তাঁর ভাই হর্ষবর্ধন থানেশ্বরও কনৌজের রাজা হন। তখন রাজ্য-পরিচালনার সুবিধার জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি কনৌজে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই-ভাবে পুষ্যভূতি ও মৌখরী রাজ্য দুটি যুক্ত হয়ে নূতন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সিংহাসনে বসার পর তাঁর প্রধান কাজ হলো গৌড়রাজ শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। মালবরাজ দেবগুপ্ত তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান কিন্তু শশাঙ্ককে তিনি দমন করতে পারেননি।



সম্রাট হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন দক্ষিণাপথেরও তাঁর রাজ্যসীমা বাড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাতাপীর চালুক্যবংশের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হয়ে সে আশা ত্যাগ করেন। তবে বর্তমান গঞ্জাম জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন কোঙ্গদ জয় করেন ও পশ্চিমভারতের বলভী রাজ্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এর ফলে কাশ্মীর, সিন্ধু, নেপাল ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ রাজপুতানা ও কামরূপ ছাড়া প্রায় সমগ্র উত্তর পশ্চিম ভারত তাঁর অধীনে আসে।

উত্তরাপথনাথ : একটি শিলালিপিতে হর্ষবর্ধনকে **উত্তরাপথনাথ** বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে সমগ্র উত্তরভারতের অধিপতি হয়েছিলেন, তা একমাত্র ঐ শিলালিপি থেকে বলা যায় না। তবে মোটামুটি ভাবে তিনি ছিলেন উত্তরভারতের সম্রাট। সকল-উত্তরা-পথেশ্বর শিলাদিত্য তিনি নন। গুপ্তসাম্রাজ্যের তুলনায় হর্ষের সাম্রাজ্য অনেকখানি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি দানশীল, সুশাসক, বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী

এবং উদার সম্রাটরূপে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। হর্ষবর্ধন প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগের রাজকোষের সমস্ত অর্থ সকলধর্মের মানুষকে দান করে দিতেন। নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট। বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' কাব্য রচনা করেন।' হর্ষবর্ধনের সময় চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী থেকে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু কিছু জানা যায়।

হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ ঃ হিউয়েন সাঙ্ (৫৯৬—৬৯৪ খ্রীঃ) চীনের সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। চীনাভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ে তাঁর ইচ্ছা হলো বুদ্ধের দেশ ভারতবর্ষে গিয়ে সে শাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলি পড়বেন। সংগ্রহ করবেন পুঁথিপত্র। সে সময়ে চীন সম্রাটের অনুমতি না নিয়ে কেউ দেশের বাইরে যেতে পারত না। তাই তিনি গোপনেই ভারতের পথে পাড়ি দিলেন। বহুদূর পথ—তার উপর আছে পাহাড় পর্বত আর মরুভূমি। পথের একমাত্র সঙ্গী যে ঘোড়া সে কিছুদিন পরে চলতে পারল না আর অন্য সঙ্গী একজন পথপ্রদর্শক গোবি মরুভূমির কাছে এসে আর যেতে চাইল না। একাই সেই মরুভূমি পার হয়ে এলেন ফাওচাঙে (বর্তমান তুরফান)। ওখানকার শাসকের কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে কারাশহর, তুর্কীরাজ্য ও সমরখন্দ ছাড়িয়ে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আফগানিস্থানে আসেন। ওখান থেকে খাইবার গিরিপথ হয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছান। বেশ কিছুদিন কাশ্মীরে থেকে তিনি সংস্কৃত ভাষা শেখেন। তিনি প্রায় তেরো বছর ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে কাশ্মীর, কামরূপ, কনৌজ, সমতট, কর্ণসুবর্ণ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ কোশল, দ্রাবিড়, অন্ধ্র, বলভী, কচ্ছ, সিন্ধু, মালব, মহারাজ, মগধ প্রভৃতি

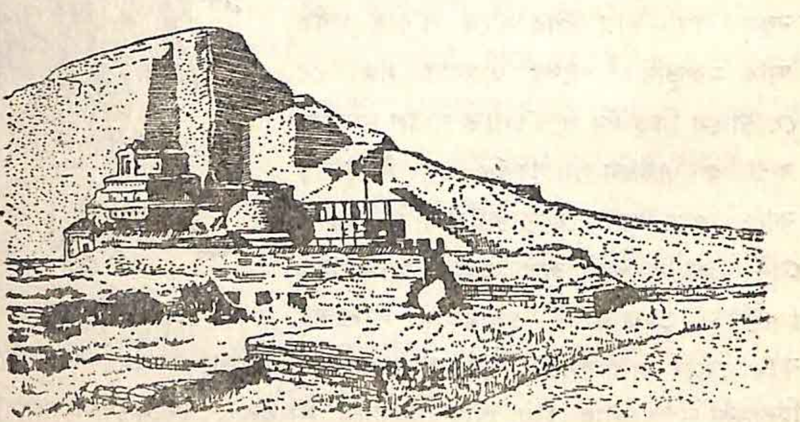


হিউয়েন সাঙ

স্থানগুলির উল্লেখ আছে। তাছাড়া তিনি সুদূর দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান ভ্রমণ করেন। সংক্ষেপে তিনি সেকালের ভারতের কথা লিখে গেছেন।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের (৬০৬—৬৪৭ খ্রীঃ) সঙ্গে চীনসম্রাটের যোগাযোগ ছিল। তাই হিউয়েন সাঙ্‌কে তিনি আন্তরিক স্বাগত জানান। মহাযান মতের প্রতিষ্ঠানের জন্য হর্ষবর্ধন কনৌজে যে বিরাট সভা করেছিলেন তাতে হিউয়েন সাঙ্‌কে প্রধান পরিচালক করেন। ঐ সভায় হিউয়েন সাঙ্ মহাযান মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনী থেকে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল তাঁর বিদ্যানুরাগ সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। হিউয়েন সাঙ্ যা দেখেছিলেন সযত্নে তাই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেজন্যই তাঁর ভ্রমণকাহিনী আজও সেযুগের ভারতের সমাজ, ধর্ম, রাজনৈতিক অবস্থার মূল্যবান তথ্য হিসেবে মর্যাদা পায়।

নালন্দা : হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে ভারতবর্ষের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। তিনি লিখছেন এই বিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুপ্তসম্রাট বালাদিত্যের তৈরী। তিনি ৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণবিহারের রাজগৃহ নামক স্থানে নালন্দায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে



নালন্দা

বুদ্ধের একটি আশি ফুট উঁচু তাম্রমূর্তি স্থাপন করেন। এই নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ গড়ে ওঠে। ক্রমে সেই মঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়। হিউয়েন

সাঙ্‌ যখন এখানে আসেন, তখন শীলভদ্র নামে একজন বাঙালী নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। হিউয়েন সাঙ্‌ তাঁর কাছে প্রায় আড়াই বছর নানা বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করেন। তাঁর বিবরণী থেকে জানা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি তখন দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিব্বত, চীন, জাভা প্রভৃতি সুদূর দেশ থেকেও ছাত্ররা এখানে জ্ঞানলাভের জন্য আসতেন। নালন্দায় মহাযান মতের প্রাধান্য থাকলেও বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো।

প্রায় দশ হাজার ছাত্র ও দেড় হাজার শিক্ষক নালন্দায় বাস করতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য বড় বড় বাসস্থান ছিল। একটি নয়তলা বাড়িতে গ্রন্থাগার ছিল। সেখানে তিনটি বড় হলঘর ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রদের থাকা খাওয়ার জন্য কোন খরচ লাগত না। সম্রাট হর্ষবর্ধন ও নালন্দার আশপাশের একশটি গ্রাম সে ব্যয় বহন করতেন।

কিন্তু নালন্দায় ছাত্র ভর্তি হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। প্রথমে পণ্ডিতগণ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা করে নিতেন। সে পরীক্ষা মোটেই সহজ ছিলনা। নালন্দায় শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক ছিল খুব মধুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন কেউ লঙ্ঘন করতে পারতনা। সকল শিক্ষনীয় বিষয়ে স্বাধীন আলোচনা চলত। এই আলোচনায় শিক্ষকছাত্র সকলেই অংশগ্রহণ করতেন। মাঝে মাঝে তর্কসভা বসত। তাতে বিজয়ী ছাত্রকে বিশেষ সম্মানে পুরস্কৃত করা হতো। নালন্দার বাসিন্দারা জলঘড়িতে সময় দেখতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কবে ধ্বংস হয় তা সঠিক জানা যায় না। শুধুমাত্র জানা যায় এই প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগানো হয়েছিল। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ আজও সেযুগের সাক্ষী হয়ে আছে।

হিউয়েন সাঙ্‌ এদেশে তেরো বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে যান। চীনসম্রাট তাঁকে রাজপদ দিতে চান। কিন্তু তিনি সে সম্মান গ্রহণ না করে মঠে থেকে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ভারত থেকে ফেরার পথে হাতীর পিঠে চড়ে নদী পার হওয়ার সময় হাতিটি ডুবে গেলে বহু পুঁথি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তিনি যা নিয়ে যেতে পেরেছিলেন সেগুলির অনুবাদ করে গেছেন। তাঁর অনুবাদগুলি আজও চীনভাষার মূল্যবান সম্পদ।

হর্ষবর্ধনের পরবর্তী যুগ ঃ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি ঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজের গৌরব অস্তমিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে কনৌজের সিংহাসন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলে তাতে রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে গুর্জর প্রতিহার বংশ, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ ও বাংলাদেশের পাল বংশ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এছাড়া আরও দুচারটি বংশ কনৌজের ভাঙা গড়ায় জড়িয়ে ছিল। এর থেকেই বোঝা যায়, কনৌজের পূর্ব গৌরব না থাকলেও রাজনৈতিক গুরুত্ব একটুকুও কমেনি।

রাজপুত ঃ রাজপুত জাতি কোথা থেকে এলো এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই জাতিতে ছত্রিশটি গোষ্ঠী রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ-বা সূর্যবংশের, কেউ-বা চন্দ্রবংশের। তবে সব রাজপুত গোষ্ঠীই নিজেদের ক্ষত্রিয় বংশ জাত বলে দাবি করেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন রাজপুত জাতির উৎপত্তি হয়েছে শক, হূন, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী জাতির সংমিশ্রনের ফলে। আবার অনেকে মনে করেন রাজপুতরা কোন জাতি নয়। তারা একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। যুদ্ধই ছিল এদের পেশা। এজন্যই ভারতের ইতিহাসে তারা ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত।

এই রাজপুত জাতি সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে সামন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজ গোষ্ঠীপতির প্রতি অনুগত ছিল। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। কিন্তু বিদেশী শত্রু তাদের দেশ আক্রমণ করলেই তারা সব হানাহানি ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরণ পণ লড়াই করত। কিন্তু দেশ শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত হলেই আবার যে কে সেই—শুরু হয়ে যেত নিজেদের মধ্যে লড়াই। ফলে কোন রাজপুত রাজাই বেশীদিন টিকে থাকেননি। তবুও এই যোদ্ধা জাতিই বিপুল বিক্রমে ভারতে মুসলমান শক্তির প্রতিষ্ঠাকে দীর্ঘদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল। বীরত্বে ও দেশভক্তিতে ভারতের ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট ও পাল বংশের প্রতিদ্বন্দিতা ঃ রাজপুতদের ছত্রিশটি গোষ্ঠীর মধ্যে যে কটি শাখা প্রধান ছিল, তার মধ্যে প্রতিহার বা গুর্জর প্রতিহার বংশ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজের সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট ও বাংলার পাল বংশও কনৌজের সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিল। ফলে প্রতিহার বংশের বৎসরাজ-এর আমলেই (৭৩৮-৭৮৭ খ্রীঃ) এই তিন বংশের মধ্যে বিরোধ বাধে। বৎসরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাগভট্ট (৮১৩-৮৩৩ খ্রীঃ) কনৌজ দখল করেন। ফলে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ ও পালরাজা ধর্মপালের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে পরাজিত করেন।

পরবর্তীকালে মিহিরভোজ (৮৩৬-৯১০ খ্রীঃ) প্রতিহার রাজ্যের গৌরব আরও বাড়িয়ে তোলেন। তাঁদের সময় প্রতিহাররাজ্য পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে এক সাম্রাজ্যের রূপ নেয়। কিন্তু কিছুদিন পরই প্রতিহার সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়। রাষ্ট্রকূট বংশ এ ভাঙনের মূলে। তাদের আক্রমণে কনৌজ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সারা উত্তর ভারতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ও অনেকগুলি ছোট ছোট রাজপুত রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মধ্য-ভারতের 'চন্দেল্ল', মালবের 'পরমার', আজমীরের 'চৌহান', গুজরাটের 'চালুক্য', উত্তরপ্রদেশের 'গাহড়বাল' প্রভৃতি। এই রাজ্যগুলির কোনটিই উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এই দুর্বলতাই ভারতে মুসলমান আক্রমণের সুযোগ করে দেয়।

বাংলাদেশের পরিচয় ঃ

সূচনা ঃ মধ্যযুগের বাংলাদেশ বলতে গৌড়কেই বোঝায়। গৌড়ের ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীন বাংলাদেশে বঙ্গ, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়, সমতট, তাম্রলিপ্ত, গৌড় প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশকে বলা হতো গৌড়। বিভিন্ন রাজাদের আমলে গৌড়ের সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে।

শশাঙ্ক ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে গৌড় রাজ্য ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজা শশাঙ্কই গৌড়ের এই গৌরব বৃদ্ধি করেন। তাঁর জীবনের প্রথম অংশ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁর রাজধানী। পশ্চিমে বারাণসী থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। অনেকে মনে করেন মগধ ও পূর্ববঙ্গ তাঁর অধিকারে ছিল। মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে কনৌজ অধিকার করতে গেলে প্রথমে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মন এবং পরে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। আগেই পড়েছ এই যুদ্ধে কনৌজ তাঁর অধিকারে আসেনি আবার হর্ষবর্ধনও শশাঙ্ককে পরাজিত করতে পারেননি।

হর্ষের সভাকবি বাণভট্ট এবং হিউয়েন সাঙ্ উভয়েই শশাঙ্ককে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন হর্ষের কাছে শশাঙ্ক কিছুই নন। কিন্তু তাঁর আমলের গৌড় রাজ্যের গৌরব মহিমা এই মন্তব্যকে অসত্য প্রমাণ করে। শশাঙ্কই বাংলা দেশের প্রথম স্বাধীন রাজা। কিন্তু তাঁর রাজত্ব কালের সঠিক সময়, তাঁর প্রথম জীবন, এমনকি মৃত্যুর সঠিক সময় এখনও আমরা জানতে পারিনি। তবে ধারণা করা হয় হর্ষের সিংহাসন লাভের সময় থেকে (৬০৬ খ্রীঃ) তাঁর রাজত্বকালের আরম্ভ এবং তাঁর মৃত্যু হয় ৬৩৭ থেকে ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। কিন্তু তিনি গৌড় ও সারা বাংলায় শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার আর অরাজকতায় সমাজ-জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এই অবস্থাকে মাৎসন্যায় বলা হয়। এই অবস্থার অবসান ঘটাতে বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ গোপাল নামে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করেন। বাংলা দেশের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

পাল রাজাদের সকলের নামে শেষে 'পাল' আছে বলে এই বংশকে পাল বংশ বলা হয়। পাল বংশের রাজারা বাংলার অধিবাসী ছিলেন। গোপালকে নিয়ে পাল বংশের আঠারোজন রাজা ৭৩০ থেকে ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল।

তাঁর পুত্র দেবপালও দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর পর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে পাল বংশের গৌরব ম্লান হয়ে যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে বিহারের কর্তৃত্ব চলে যায় মুসলমানদের হাতে।

সেন বংশীয়রা বাংলার বাইরের অধিবাসী। যতদূর জানা যায় দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকে তাঁদের দেশ। বাংলায় সেনবংশের প্রতিষ্ঠা করেন **সামন্ত সেন**। এই বংশ ১০৯৫ থেকে ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। কিন্তু বিজয় সেন সর্ব প্রথম রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। সমগ্র রাঢ়, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। ত্রিবেণীর নিকটে ছিল তাঁর রাজধানী। নিজ নাম অনুসারে রাজধানীর নাম রাখেন বিজয়পুর। এছাড়া পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে তাঁর আর একটি রাজধানী ছিল। এই বংশের রাজা বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন উড়িষ্যা, গৌড় ও আসাম জয় করেন। কিন্তু শেষকালে ইখতিয়ার-উদ্দিনের হাতে পরাজিত হয়ে বিক্রমপুরে পালিয়ে যান। সেখানে তাঁর বংশধরেরা কিছুদিন রাজত্ব করেন। পরে সেখানেও মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।



পালযুগের শিল্প নিদর্শন

পাল যুগে বাংলাদেশের সমাজ : পাল রাজারা বাংলাদেশে মাৎস্যন্যায় যুগের অবসান ঘটিয়ে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি তাঁরা অশ্রদ্ধা দেখাননি। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁদের কাছে সমান সম্মান পেতেন। পণ্ডিতরা যাতে নির্বিঘ্নে জ্ঞানচর্চা করতে পারেন সেজন্য তাঁরা তাঁদের জমি দান করতেন।

প্রজাদের অর্থকষ্ট দূর করতে তাঁরা মাঝে মাঝে করভার কমিয়ে দিতেন। এদিক থেকে রাজা রামপাল আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। জনসাধারণের উপকারের জন্য পাল রাজারা বহু দিঘি খনন করেন। স্থপতি, ভাস্কর ইত্যাদি শিল্পীদের তাঁরা উৎসাহ দিতেন। সে যুগে এক শ্রেণীর লোক সুন্দর হস্তাক্ষরে পুঁথি নকল করতেন এবং পুঁথিকে চিত্রিত করে তার সৌন্দর্য বাড়াতেন। এই শিল্পকলা পাল রাজাদের দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। এইভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে পাল যুগ একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে।

পাল যুগে ধর্ম ও বিদ্যাচর্চাঃ পাল রাজারা দেশে কেবল শান্তি শৃঙ্খলাই ফিরিয়ে আনেননি—বাঙালীর ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতির উন্নতি সাধনেও সচেষ্ট হন। তাঁরা বহু মঠ, মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। তিব্বতী ভাষায় লেখা একখানি পুঁথি থেকে জানা যায় যে, ধর্মপাল বৌদ্ধ ছাত্রদের শিক্ষার জন্য পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমশীল বিহারও তিনিই নির্মাণ করেন। এটি বর্তমান ভাগলপুর জেলায় পাথরঘাটায় অবস্থিত। বাঙালী পণ্ডিত অতীশ পাণ্ডিত্যের জন্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিত হন এবং মহীপালের আমন্ত্রণে বিক্রমশীল বিহারের আচার্যপদ গ্রহণ করেন। সেযুগে এই বিহারের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তিব্বত থেকে বহু আচার্য এখানে পড়াশোনা করতে আসতেন। একশ'র বেশী অধ্যাপক এখানে পড়াতেন। এখান থেকেই বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতের রাজার আহ্বানে তিব্বতে যান। তিনি তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার করেন। বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতির সঙ্গে বাংলাদেশে ব্যাপক বিদ্যাচর্চা শুরু হয়।

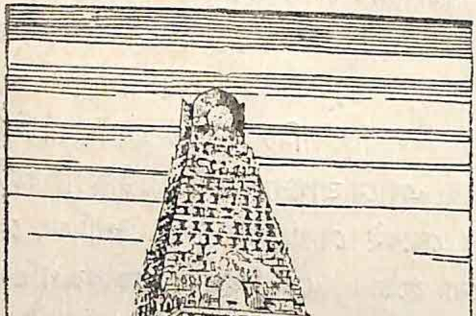
এ যুগের দলিল দস্তাবেজ থেকে জানা যায় যে, তখন বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতির চর্চা হতো। পাল রাজাদের উৎসাহ পেয়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। নাথপন্থী সিদ্ধাচার্যরা বহু গান ও দোঁহা রচনা করেন। এগুলিকে বলে চর্যাপদ। চর্যাপদগুলিতে সেযুগের বাংলাদেশের সমাজজীবনের চিত্র রয়েছে। চর্যাপদের ভাষাকেই বাংলা ভাষার আদিরূপ বলে মনে করা হয়। রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর

নন্দী 'রামচরিতমানস' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তিকাহিনী ও রামপালের কার্যকলাপ একই সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

এযুগে চিকিৎসা শাস্ত্রেরও উন্নতি হয়। আগেই বাংলাদেশে 'চরক সংহিতা' ও 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়। গাছগাছড়া থেকে ওষুধ তৈরীর নিয়মাবলী নিয়েও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে পাওয়া সোমপুর বিহারের ভগ্নাবশেষ সেযুগের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় দেয়। এতবড় বৌদ্ধ বিহার সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের কোথাও ছিলনা। এখানে একটি বিরাট মন্দিরও পাওয়া গেছে। মন্দিরের সঙ্গে রয়েছে ভোজনালয়, স্নানাগার ইত্যাদি। মন্দিরের গায়ে রয়েছে পাথর ও পোড়ামাটির কাজ এবং বহু দেবদেবীর মূর্তি। এর থেকে বোঝা যায় তাঁরা স্থাপত্য ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকলায় উৎসাহ দিতেন এবং ধর্ম সম্পর্কেও খুব উদার ছিলেন। এই যুগেই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ধীমান ও বিটপাল জন্মগ্রহণ করেন। এ যুগের আর একটি শিক্ষাকেন্দ্র ওদন্তপুর বিহার। এই বিহার সম্পর্কে খুব বেশী জানা যায় না। শুধুমাত্র জানা গেছে পালবংশের প্রথম রাজা গোপাল নালন্দার প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তরে এই বিহার নির্মাণ করেন। পরবর্তী পাল রাজারা এখানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। এর থেকেই বোঝা যায় বেদ, উপনিষদ, বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রভৃতি এখানে পড়ানো হতো। এই বিহারের প্রভাকর পণ্ডিতের নাম বিখ্যাত। দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানে এক হাজার ভিক্ষু বিদ্যার্থী বাস করতেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন মুসলমান আক্রমণে প্রায় একই সময়ে বিক্রমশীলা, নালন্দা ও ওদন্তপুর ধ্বংস হয়ে যায়।

সেনযুগের সমাজ, ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা: সেনবংশ ১০৯৫ থেকে ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। পালবংশের পতনের পর বাংলাদেশে যে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে, সেন রাজাদের আমলে তা দূরীভূত হয়। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। কাজেই সেযুগে সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বেড়ে যায়। বৌদ্ধরা জাতিভেদ মানতেন না বলে, হিন্দু সমাজে বড় রকম ভাঙন ধরেছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এতদিন যাদের অস্পৃশ্য বলে

ঘৃণা করতেন, তারা দলে দলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু সেনরাজারা ছিলেন হিন্দু। তাই সেনযুগে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য দেখা দেয়। বল্লালসেনের প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা। বিশেষ করে কুলের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য বল্লালসেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। সেনরাজারা সারা বাংলাকে রাজনৈতিক সূত্রে বেঁধেছিলেন। সামাজিক ঐক্যও তাঁরা নষ্ট হতে দেননি। সেনরাজারা সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিতে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পের উন্নতিতেও তাঁদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ছিলেন জয়দেব, উমাপতিধর, গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী ইত্যাদি। গোবর্ধনের **আর্যাসপ্তশতী,** উমাপতিধরের **পবনদূত** ও জয়দেবের **গীতগোবিন্দ** এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। এইযুগে নির্মিত দেবমূর্তি, চিত্রাঙ্কিত পুঁথিপত্র সেনরাজাদের শিল্পানুরাগের পরিচয় দেয়।



মহাবলিপুরমের মন্দির

দক্ষিণ ভারত ঃ

চালুক্য ও পল্লব বংশ ঃ গুপ্তযুগের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে যে দুটি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে তার মধ্যে একটি হলো বর্তমান বিজাপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত বাতাপি বা বাদামির চালুক্যরাজ্য ; অন্যটি হলো কাঞ্চীর পল্লব-রাজ্য। প্রথমটির প্রতিষ্ঠা হয় ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয়টির প্রতিষ্ঠা হয় চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি। দক্ষিণ ভারতে কে প্রাধান্য স্থাপন করবে তা নিয়ে এঁদের

সাপে-নেউলে সম্বন্ধ ছিল। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৮—৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ) দক্ষিণভারতের প্রায় সমস্ত রাজাকে পরাজিত করে উত্তরে নর্মদা থেকে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। কিন্তু শেষজীবনে তিনি কাঞ্চীরাজ নরসিংহবর্মনের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। তাতেও এই দুই রাজ্যের শত্রুতা বন্ধ হয়নি অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি বাতাপির চালুক্যবংশের পতন ঘটে।

তেমনি একই সময়ে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লবরাজ প্রথম নন্দীবর্মনের কাছ থেকে তাঁর রাজধানী কাঞ্চী ছিনিয়ে নেন। ফলে কাঞ্চী-রাজ্যেরও গৌরব অনেকখানি বিনষ্ট হলো। আসলে দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষের ফলে দুটি রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে নাসিককে রাজধানী করে দান্তিদুর্গ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকূট বংশ দক্ষিণ ভারতে প্রবল হয়ে ওঠে। এই রাষ্ট্রকূট বংশের আমলেই ইলোরা পর্বতগাত্রের অপূর্ব গুহাস্থাপত্য তৈরী হয়। বাতাপির চালুক্যবংশ ও কাঞ্চীর পল্লববংশ এত যুদ্ধবিগ্রহ করেও স্থাপত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।



নটরাজের মূর্তি

হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে জানা যায় নরসিংহবর্মনের সময়ে কাঞ্চীর গৌরব উচ্চশিখরে ওঠে। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সমস্ত ধর্মের মানুষ সমান উৎসাহ পেত। তাই কাঞ্চীশহরে তিন শ্রেণীর মন্দিরই পাওয়া যায়। এইসব

মন্দিরে কেবল পূজাপার্বনই নয়—বিদ্যাচর্চা ও সংগীতচর্চাও হতো। দক্ষিণ-ভারতের সভ্যতাই মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। ভক্তিবাদী রামানুজ কাঞ্চীরই অধিবাসী। একসময় তাঁর ভক্তিবাদ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আবার বিখ্যাত বৌদ্ধদার্শনিক ধর্মপালের জন্মস্থানও কাঞ্চী। কৈলাসনাথের মন্দিরের অপূর্ব গঠনকার্য, মহাবলীপুরমের সপ্তরথমুক্তেশ্বর, ত্রিপুরান্তকেশ্বর, ঐরাবতেশ্বর মন্দির দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই মন্দিরগুলি এক একটি বড় পাথর খোদাই করে করা হয়েছে। তার সঙ্গে আছে নানাধরণের প্রস্তরচিত্র। চালুক্য বংশের রাজত্বকালে অজন্তার গুহাচিত্র এবং বাতাপির বিখ্যাত গুহামন্দিরগুলি নির্মিত হয়। চালুক্য ও পল্লব বংশীয়রা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। কিন্তু এই মন্দিরগুলিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন তিন ধর্মেরই নিদর্শন আছে। এতে বোঝা যায় ধর্ম সম্বন্ধে রাজাদের উদারতা ছিল।

চোলবংশের নৌশক্তি ঃ প্রথম শতাব্দীতে রাজা কারিকল প্রতিষ্ঠিত চোল বংশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কারিকল সিংহলের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পার্শ্ববতী রাজ্যগুলির বিশেষ করে পল্লবদের আক্রমণে চোলরাজ্যের পতন হয়। তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী থেকে প্রায় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত চোল রাজাদের আধিপত্য ছিলনা। দীর্ঘকালের জন্য এটি পল্লবরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হিউয়েন সাঙ্ যখন এখানে আসেন তখন এটি পল্লবদের অধীনে ছিল। পরে চালুক্য ও পল্লববংশের বিবাদের সুযোগে নবম শতাব্দীতে চোলরাজ্য পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। চোলরাজারা স্থাপত্যশিল্পে প্রচুর উৎসাহ দিতেন। তঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরের শিবমন্দির ও তার ব্রেঞ্জের নটরাজমূর্তি এবং গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমের মন্দির চোল শিল্পরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এই বংশ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করে। এইরূপ দীর্ঘকাল রাজত্ব করার মূলে ছিল চোলরাজ্যের সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা। তাঁরা রাজ্যের আর্থিক উন্নতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। আবার রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখতে স্থল ও নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এক কথায় বলা যায় ঐসময় চোল রাজারাই ঐ অঞ্চলের সমুদ্রের

একাধিপতি ছিলেন। চোলবংশের প্রথম রাজা দীর্ঘকাল সিংহলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে তাঁর নৌবাহিনী এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তার সাহায্যে তিনি পেগু, মার্তাবান, আন্দামাননিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেন। ঐ বাহিনী নিয়ে বাংলাদেশে এসে গঙ্গার স্রোত ধরে পালসম্রাট মহীপালের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং গঙ্গইকোণ্ড উপাধি লাভ করেন।

চোলরাজ্যের এই বিশাল নৌবাহিনী সুমাত্রা মালয় উপদ্বীপও জয় করে। কিন্তু এই জয় স্থায়ী রাজ্য গঠন করার জন্য না ধনসম্পত্তি লুঠ করার জন্য তা সঠিক করে জানা যায়নি। তবে এটুকু সত্য যে চোলরাজ্যের এক শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। আর ছিল বিরাট বিরাট সওদাগরী জাহাজ। এই জাহাজগুলি জলপথে নানাস্থানে ব্যবসাবাণিজ্য করতে যেত। সপ্তম শতাব্দী থেকে আরবের বাণিজ্যজাহাজও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য করতে আসত। এই সব জাহাজের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্য চোল নৌবাহিনীর গুরুত্ব ছিল অনেক।

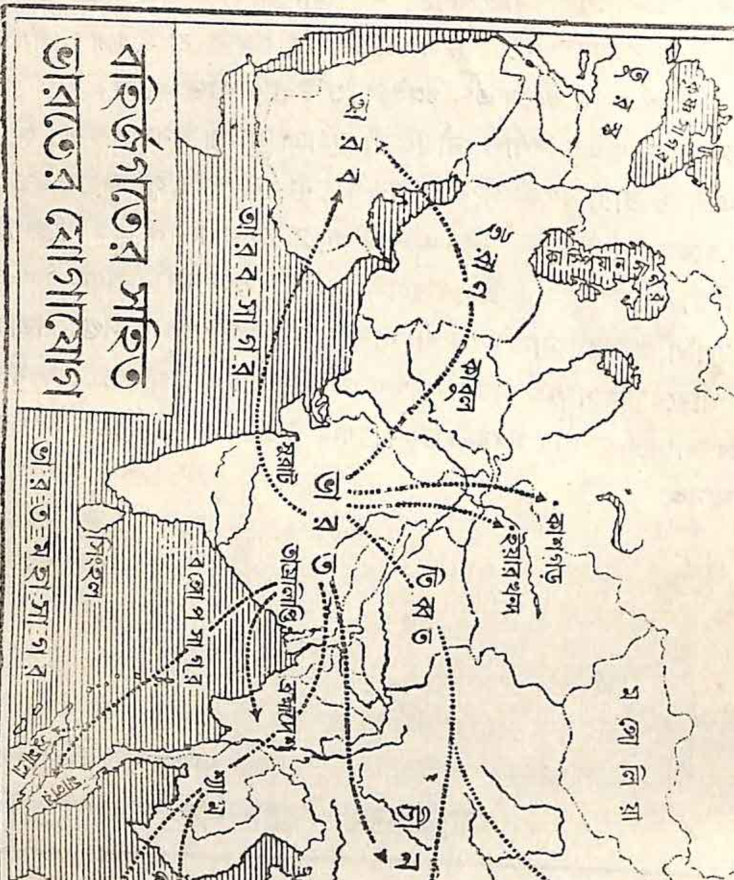
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভারতের বৈদেশিক যোগাযোগ

স্থলপথে ভারতের যোগাযোগ (মধ্য এশিয়া) ঃ

প্রাচীনকালে থেকে নানাভাবে বিদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে এই সম্পর্ক আরও বিস্তৃত হয়। জল ও স্থল উভয় পথে এই যোগাযোগ গড়ে ওঠে। স্থলপথে প্রধানতঃ চীন, তিব্বত ও মধ্যএশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। স্থলপথে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জে।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম ঃ বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রচার লাভ করে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান এই দুই অংশে বিভক্ত



হয়ে যায়। কুষাণযুগে মহাযান মতের প্রাধান্য বেড়ে যায়। মধ্যএশিয়ায়

কুষাণদের আধিপত্য ছিল ফলে সেখানেও মহাযান মত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আরও শোনা যায় তারও বহু পূর্বে অশোকের পুত্র কুণাল মধ্যএশিয়ার খোটানে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এইভাবে নানাভাবে মধ্যএশিয়ায় ভারতের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। কিন্তু কালক্রমে ঐ উপনিবেশ মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। কিছুকাল আগে প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার অরেলস্টাইন খোটানে খননকার্য করে বহু স্তূপ, মঠ, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করেন। জানা গেছে পূর্বে খোটানের সংস্কৃত নাম ছিল কুস্তন। খোটানে পাওয়া সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে সেখানে রাজার উপাধি ছিল **মহারায় মহারাজা দেবপুত্র**। এখানকার দর্শনীয় স্থান ছিল গোমতী বিহার। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এখানে একশটি বৌদ্ধবিহার ও পাঁচহাজার বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন। মধ্যএশিয়ার ইয়ারখন্দ, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ গুহা আবিষ্কৃত, হয়েছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে খোটান ও মধ্যএশিয়া থেকেই স্থলপথে চীনে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। পরে সেখান থেকে ক্রমশঃ জাপান ও কোরিয়ায় প্রচারিত হয়।

চীনঃ ভারত চীনের সম্পর্ক বহুদিনের। এ সম্পর্ক কেবল ধর্মভিত্তিক ছিলনা—বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কও ছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব থেকেই বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রসারিত হয়। বহু চীনা পর্যটক ভারতে আসেন। এদের মধ্যে ফাহিয়েন আসেন গুপ্তযুগে এবং হিউয়েন সাঙ আসেন হর্ষবর্ধনের সময়। ভারত থেকে চীনে যান জ্ঞানভদ্র, যশোগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ। কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মই চীনে প্রচারিত হয়নি—চীনা ও ভারতীয় পণ্ডিতদের মিলিত প্রচেষ্টায় বহু বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত হয়ে চীনা সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, সংগীতশাস্ত্র ইত্যাদি চীনে প্রসারলাভ করে। চীনের তা তুন-হোআঙের পাহাড়ে **সহস্রগুহা** থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধ শিল্পরীতিও চীনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তিব্বত (অতীশ দীপঙ্কর)ঃ ভারতের উত্তরে দুর্গম পর্বতঘেরা তিব্বত

মালভূমি। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বহু ছাত্র তিব্বত থেকে নালন্দায় ও পরে বিক্রমশীল বিহারে পড়াশোনা করতে আসতেন। তাঁরা বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করে নিয়ে যেতেন। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্মে নানান অন্যায় ও কুসংস্কার প্রবেশ করে। একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতের রাজার অনুরোধে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে একজন বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে যান ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন। যতদূর জানা যায় এই বিখ্যাত পণ্ডিত পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) বিক্রমপুরে এক বড় জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তাঁর ছেলেবেলার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। যৌবনে তিনি আচার্য শীলভদ্রের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। শিক্ষাশেষে তিনি উপাধি পান দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তখন থেকে তাঁর নাম হয় অতীশ তারপর তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হন। তিব্বতে যাওয়ার অনুরোধ যখন আসে তখন তাঁর বয়স ষাট। তবুও তিনি দুজন তিব্বতী ভিক্ষুকে সঙ্গে করে দুর্গম পথ পাড়ি দেন। তিব্বতের অ্যালং মঠে থেকে প্রায় বারো বছর ধরে তিনি তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করে তাকে সর্বপ্রকার মালিন্য ও কুসংস্কার মুক্ত করেন। তিনি তিব্বতী ও সংস্কৃত ভাষায় প্রায় একশটি গ্রন্থ রচনা করেন। ওখানেই তিনি ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিব্বতের নি-থ্যাং মঠে তাঁর সমাধি রয়েছে। তিব্বতীরা আজও তাঁকে বোধিসত্ত্বরূপে শ্রদ্ধা করে।



অতীশ দীপঙ্কর

জলপথে ভারতের যোগাযোগ :

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব : প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। বাংলার তাম্রলিপ্ত

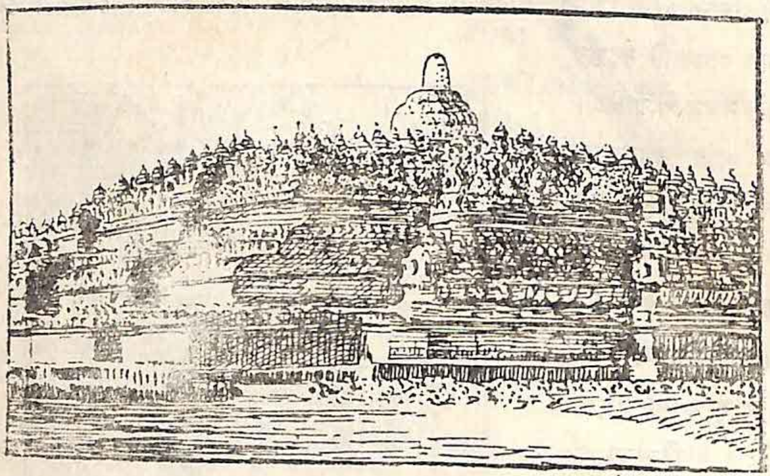
থেকে শুরু করে মাদ্রাজের নাগপট্টম পর্যন্ত উপকূলবাসী বণিক ও নাবিকগণ এই অঞ্চলে পণ্য আদানপ্রদান করতেন। বিচিত্র রত্নের ভাণ্ডার ছিল এই দেশ। ভারতবাসী তাই এর নাম দিয়েছিল 'সুবর্ণভূমি'। পণ্যবিনিময় ও রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেশে পৌঁছেছিল ভারতের ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পকলা। উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ ইত্যাদি অঞ্চলে।

সুবর্ণভূমি ঃ কম্বোজ (বর্তমান কাম্বোডিয়া), মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ (বর্তমান জাভা) সুমাত্রা, বোর্ণিও, আনাম, বলিদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলকে একত্রে সুবর্ণভূমি বলা হতো। সুমাত্রা দ্বীপকে বলা হতো সুবর্ণদ্বীপ। এই সুবর্ণভূমিতে এক সময় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা এমনভাবে মিশে যায় যে এখনও অঞ্চলটি বৃহত্তর ভারত নামে পরিচিত। আজ আর তখনকার যোগসূত্র নেই। কিন্তু তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সেখানকার মঠ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে। প্রাচীন যুগে কম্বোজে একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। এর রাজধানী ছিল যশোধরপুর। পরে এর নাম হয় আঙ্কোরথম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রশস্ত প্রাচীর ও পরিখা দিয়ে ঘেরা রাজধানী আঙ্কোরথম সৌন্দর্যে সে আমলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। সারা নগরীতে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য প্রাসাদ ও মন্দির। এই নগরীর কেন্দ্রে অবস্থিত বেয়নের শিবমন্দির স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ



বেয়নের শিবমন্দির

নিদর্শন। আঙ্কোরথমের কিছু দূরে আঙ্কোরভাট। এখানে দ্বাদশ শতাব্দীতে কম্বোজের রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মন এক বিশাল বিষ্ণুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের গায়ে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী খোদাই করা আছে। এগুলি কেবলমাত্র শিল্পকলার নিদর্শন নয়, লোকশিক্ষারও মাধ্যম ছিল। শৈব ও বৈষ্ণবধর্মও যে সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছিল, তা এই মন্দিরগুলি থেকে বোঝা যায়। পরবর্তীকালে মন্দিরের ভাস্কর্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও পড়েছিল। এগুলি রাজা ও প্রজাদের আর্থিক দানে গড়ে ওঠে।



বরবুদরের মন্দির

কম্বোজের পূর্বদিকে আধুনিক আনাম অঞ্চলটি তখন চম্পা নামে খ্যাত ছিল। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। এখানকার ভদ্রেশ্বরস্বামী শিবমন্দির ধর্মচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল।
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি সিংহল, পেগু ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করেন।

মালয়ঃ মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহুদিনের। অনেকে মনে করেন মালয় নামটির সঙ্গে ভারতের বিশিষ্ট গোষ্ঠী মালবদের সম্পর্ক থাকতে পারে। টলেমির ভূবৃত্তান্ত ও বৌদ্ধজাতক থেকে জানা যায় যে, মালয়ই একসময় সুবর্ণদ্বীপ বা সুবর্ণভূমি বলে পরিচিত ছিল। ভারতের

সঙ্গে তার ব্যবসাবাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। **শৈলেন্দ্রবংশ** এখানে বহুকাল শাসন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

যবদ্বীপ (বর্তমান জাভা) পঞ্চম শতাব্দীর পরে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সেখানে অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। এঁরা বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতে বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলা তথা সমগ্র ভারতের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ছিল। এঁদেরই একজন রাজা নালন্দায় একটি মঠ তৈরী করে দেন। কুমার ঘোষ নামে এক বাঙালী বৌদ্ধপণ্ডিত একসময়ে শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। জাভায় অবস্থিত **বরবুদুরের বৌদ্ধস্তূপ** এঁদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি। বিরাট পাহাড়ের উপর এই বৌদ্ধ মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরের গায়ে অনেক বুদ্ধমূর্তি ও জাতকের গল্প খোদাই করা আছে। এই স্তূপ পৃথিবীর এক পরম আশ্চর্য কীর্তিরূপে খ্যাতি লাভ করেছে। রামায়ণে জাভাকে বলা হয়েছে যবদ্বীপ। শৈলেন্দ্রবংশের পর শ্রীবিজয় আবার এখানে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সে রাজ্য মুসলমানরা অধিকার করেন।

বরবুদুর ছাড়াও যবদ্বীপের নানাস্থানে অসংখ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে। সংস্কৃতগ্রন্থের বহু পুঁথি যবদ্বীপে পাওয়া গেছে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে আজও সেখানে ছায়াচিত্র, নাটক ইত্যাদি তৈরী হয়। বলিদ্বীপের অধিকাংশ অধিবাসী আজও হিন্দু।

বৃহত্তম ভারতে হিন্দুসভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব, হিন্দু উপনিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নানা তথ্য আবিষ্কার করেছেন। পুরোনো পুঁথিপত্র থেকে তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, বৃহত্তম ভারতের উপনিবেশগুলিতে সরকারী ভাষা ছিল সংস্কৃত। প্রাপ্ত শিলালিপিগুলিও সংস্কৃত ভাষায় লেখা। ভারতীয় নামের সঙ্গে রাজারাজড়া ও বংশের নামের মিল আছে। প্রাচীন মন্দির, মঠ, স্তূপের ধ্বংসাবশেষ এবং তাদের গঠনশৈলীতে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন শিল্পশৈলীর প্রভাবই ভারতের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুলতানী আমলে ভারতবর্ষ

তুর্কী-আফগানদের ভারতের আগমন ও তার উদ্দেশ্য : আরব সাম্রাজ্য যখন দ্রুত ভেঙে পড়ছিল তখন সেখানে তুর্কীদের আবির্ভাব



হয়। খলিফাদের অকর্মণ্যতা ও দুর্বলতার সুযোগে তুর্কীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল গজনী ও খোয়ারিজম রাজ্য। গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুর্কী ক্রীতদাস আলপ্তগীন। খোয়ারিজম ছিল শাহের রাজ্য। এই খোয়ারিজমে বাস করত তুর্কীদের ঘুর বংশ। চেঙ্গিস খাঁর ভয়ে খোয়ারিজমের শাসকের পলায়নের পর ঘুর বংশ আধিপত্য বিস্তার করে।

এই শক্তিশালী তুর্কী রাজ্যগুলিই ভারত আক্রমণ শুরু করে। এই আক্রমণের প্রথম উদ্দেশ্য লুণ্ঠন; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইসলামী সভ্যতার বিস্তার। গজনীর সুলতান মামুদ সতেরবার ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। খোয়ারিজমের ঘুর বংশের মহম্মদ ঘোরী দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর প্রধান সেনাপতি ও জামাতা কুতুবুদ্দিন আইবক সুলতান উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময় থেকে পাঁচটি বংশ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন—দাস বংশ, খিলজী বংশ, তুঘলক বংশ, সৈয়দ বংশ ও লোদী বংশ। এই সকল বংশের সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিস, গিয়াসুদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খিলজী, মহম্মদ বিন তুঘলক, ইত্যাদি নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ। রিজিয়া নামে এক নারী কয়েক বছর দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি ইখতিয়ার বিন বখতিয়ার খিলজী সেন বংশের শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।


গিয়াসউদ্দিন বলবন


মহম্মদ বিন্ তুঘলক

সুলতানী আমলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ সুলতানরা নামে মাত্র খলিফাদের প্রতিনিধি হিসাবে শাসন করতেন। প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্যে তাঁরা নিজেরাই ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁরা প্রত্যেক রাজ্যকে কয়েকটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। সুলতানের নিযুক্ত প্রতিনিধি ছিলেন প্রদেশের শাসনকর্তা। এইসকল প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সামন্ত বা জমিদার। সুলতানী শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গোটা রাজ্যজুড়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হতো। ফলে বিদেশী শত্রুর আক্রমণ সহজ হতো। জিজিয়াকর এবং ন্যায়বিচারের অভাব অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে বাধার সৃষ্টি করত।



আলাউদ্দিন খলজী

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বর্ণবিদ্বেষ ও অবিচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং মুসলমানদের সাম্য-নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে এইসময় অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। উচ্চ রাজপদ পাওয়ার জন্য অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দুও ইসলামধর্ম গ্রহণ করতেন। এইভাবে সর্বত্র হিন্দুধর্মের মধ্যে অনৈক্য ও ভাঙন সৃষ্টি হয়। হিন্দুসমাজের এই ভাঙন রোধ করবার জন্য দক্ষিণ ভারতের মাধবাচার্য, বাংলার রঘুনন্দন প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ হিন্দুশাস্ত্রের বিধানগুলিকে কঠোরতর করে তোলেন। সতীদাহ, জহরব্রত ইত্যাদি কুসংস্কারগুলি সমাজে জোরদার হতে থাকে। অপরদিকে মুসলমান সমাজ এধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্ত ছিল। সমাজে নারীজাতির সম্মান স্বীকৃত হলেও কঠোর পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা, সঙ্গীত প্রভৃতিতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। বহু মহিলা অস্ত্রচালনাতেও কৃতিত্ব দেখান। এ সম্পর্কে দিল্লীর অন্যতম মহিলা সুলতানা রিজিয়ার নাম

উল্লেখযোগ্য। বিজয়নগরের রাজমহিষী স্বয়ং ছিলেন সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শিনী।

বৈদেশিক পর্যটক, এদেশের কবি ও ঐতিহাসিকগণের রচনা থেকে সুলতানী আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায়। তখন দেশের ঐশ্বর্য ছিল বিপুল। কিন্তু সে ঐশ্বর্য রাজকর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিরাট। মধ্যযুগের কৃষকদের নানারূপ দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যে জীবন কাটাতে হতো। সাধারণ মানুষের জীবন ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। দ্রব্যাদির মূল্য ছিল খুব কম। বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের ব্যাপকতা ছিল বিশাল।



সুলতানা রিজিয়া

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে পারস্পরিক প্রভাবঃ সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে যেমন সংঘাত ছিল তেমনি সমন্বয়ও ঘটেছিল। এই ধর্মসমন্বয়ে মুসলমান দরবেশ, সুফীসাধক এবং হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের বহু অবদান আছে। মুসলমানগণ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ও সমাজ ব্যবস্থায় সাম্যবাদী। অপরদিকে হিন্দুরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন এবং সমাজে রয়েছে জাতিভেদ প্রথা। মূল হিন্দু ধর্মে যে একেশ্বরবাদ ছিল ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে এসে তা পুনরায় পরিস্ফুট হলো। হিন্দুসমাজের বহু শাস্ত্রজ্ঞ সংস্কারক জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ শুরু করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে **রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর, নানক ও নামদেব** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এইসকল ধর্মগুরু প্রচারিত একেশ্বরবাদের আদর্শ বহু সাধারণ মুসলমানদের আকৃষ্ট করে। রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতি ধর্ম-প্রচারকের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু শিষ্য ছিল। মুসলিম পীরদের কেন্দ্র করে যেসব উৎসব অনুষ্ঠান হতো তাতে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুরাও অংশ গ্রহণ করত। এইভাবে বহুকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে উভয় সম্প্রদায়ই খুব কাছাকাছি আসে ও শিল্পসাহিত্য সৃষ্টিতে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে।

সুলতানী আমলে সাহিত্য ও শিল্পকলাঃ মুসলমান সুলতানগণ সাহিত্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময় হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রতিভায় সাহিত্য ও শিল্পে চরম উন্নতি ঘটে। এইযুগে সংস্কৃত-সাহিত্যে জয়দেব গোস্বামী, রূপগোস্বামী, মাধবাচার্য, বিশ্বেশ্বর, রঘুনন্দন প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিতদের প্রতিভায় সমৃদ্ধ হয়। সুলতান মামুদ গজনভী, মহম্মদ ঘোরী, বলবান, রাজিয়া এবং মহম্মদ তুঘলক তাঁদের মুদ্রায় আরবী অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহার করে ভারতীয় ভাষাকে মর্যাদা দান করেন।

এই যুগে ধর্ম আন্দোলনের ফলে লৌকিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আগে সংস্কৃতভাষাতে ধর্ম ও বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। সুলতানীযুগে ধর্মপ্রচারকগণ জনসাধারণের মুখের ভাষায় ধর্মপ্রচার করলেন। ফলে হিন্দী, মারাঠী, বাংলা গুরুমুখী প্রভৃতি ভাষা অনেক উন্নত হয়। বাংলার মুসলমান শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলি বাংলা কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। হিন্দী ও ফার্সী ভাষার সমন্বয়ে নূতন ভাষা উর্দুর জন্ম হয়। আলাউদ্দিনের সভাকবি আমীর খসরু ফার্সী ভাষায় কাব্য রচনা করেন। ফিরোজশাহ তুঘলক বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সীতে অনুবাদ করান। সিকান্দার লোদীও চিকিৎসাশাস্ত্রের একখানি সংস্কৃতগ্রন্থ ফার্সীতে অনুবাদ করান। মিনহাজউদ্দিনের **তবকাত্-ই-নাসিরী** এবং জিয়াউদ্দিন বারনির **তারিখ-ই-ফিরোজশাহী** এইযুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

সুলতানী আমলে হিন্দু মুসলিম স্থাপত্য রীতির সমন্বয় ঘটে ও নূতন শিল্পকলার জন্ম হয়। সুলতানী আমলের দিল্লী, জৌনপুর, বাংলা ও গুজরাটের স্থাপত্যরীতির মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। দিল্লীর

স্থাপত্যশিল্পে মুসলিম প্রভাবের প্রাধান্য আজও বিদ্যমান। কুতুবমিনারের আলাই দরওয়াজা আলাউদ্দিনের জামাআত খান মসজিদ, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা সুলতানী যুগের উৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন। বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্যশিল্পে হিন্দু প্রভাব লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই স্থাপত্যরীতি অনুসারে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, ছোট সোনামসজিদ, বড় সোনামসজিদ নির্মিত হয়। গুজরাটের জাম-ই মসজিদ, আহমদাবাদে সিদি সৈয়দের মসজিদের সূক্ষ্ম কারুকার্য স্থানীয় প্রভাবেই সৃষ্টি হয়।

ভক্তিবাদ ও মধ্যযুগের সাধুসন্ত ঃ মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পরস্পরের মিলনের ফলে ভক্তিবাদ নামে একটি নূতন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামধর্মের সুফীবাদী ও হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদী মহাপুরুষগণ প্রচার করলেন যে, সব মানুষ সমান এবং সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। মানুষকে ভালোবাসলেই ঈশ্বরসাধনা করা হয় বলে তারা মনে করতেন। সুফীদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আউলিয়া, মইনুদ্দিন চিশতি ও কবীর, নানক হিন্দু মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য উল্লেখযোগ্য।

কবীর ঃ কবীর রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলাম-ধর্মাবলম্বী। কাপড়বোনা ছিল তার জীবিকা। কবীরের ধর্মমতের মূল কথা ছিল মুসলমানদের রহিম ও হিন্দুদের রাম এক এবং অভিন্ন। তিনি সহজ সরল ভাষায় গানের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করতেন। এই গানগুলি কবীরের দোঁহা নামে পরিচিত। তার ভক্তিবাদ প্রচারের ফলে ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কারগুলি অনেকাংশে দূর হয়।



কবীর

নানক ঃ ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের এক গ্রামে নানক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মধ্যযুগের আর একজন ধর্মপ্রচারক। তিনি কোন জাতিভেদ

মানতেন না। তাঁর ধর্মের মূলকথা ছিল ঈশ্বর এক। ধর্মবিশ্বাসের জন্য মানুষে মানুষে বিভেদ করা যায়না। সব মানুষই সমান। সুতরাং জাতিভেদ মিথ্যা। ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরভক্তি ও মানুষকে ভালোবাসা। তিনি নিজে কোন বিশেষ ধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিলেন না। সাধনা শুরু করে তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। তিনি একবার মক্কায়ও গিয়েছিলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম শিখ। শিখ অর্থ শিষ্য।



নানক

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব : ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব বাংলার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর ধর্মের মূলকথা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা, জীবে দয়া ও সকল মানুষকে ভালোবাসা। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। মুসলমানদেরও তাঁর শিষ্য হতে বাধা ছিল না।

মধ্যযুগের এই সকল ধর্মপ্রচারকদের উদার নীতি ও আদর্শের ফলে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি আসে।

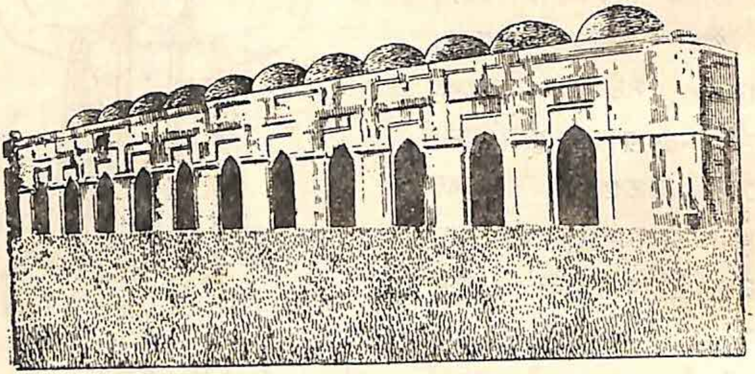
বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশের এক বিরাট অংশ দখল করে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু এই অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সুলতান বলবনের উত্তরাধিকারীগণের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে ইলিয়াস্ শাহের ও হোসেন শাহের বংশ স্বাধীন রাজত্ব শুরু করেন। এই দুই বংশের শাসনকালে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে অনেকখানি স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে।

ইলিয়াস শাহ ও হোসেন শাহ দুজনেই উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এই বংশ দুটির শাসনকালে হিন্দু মুসলমানের বিভেদ দূর হয়ে অনেকটা প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কবিগণ মঙ্গল কাব্যের শুরুতে দেবদেবী ও দিকবন্দনা করতে গিয়ে পীর বন্দনাও করেছেন। মুসলমানের সত্যপীর হিন্দুদের কাছে সত্যনারায়ণরূপে পূজা পান। সমাজের উচ্চস্তরেও হিন্দুগণ রাজ্যশাসন ব্যাপারে মুসলমান শাসকের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। রাজকার্যে নিযুক্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দরবারী আদব-কায়দা পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে পিছ-পা হলেন না। হোসেন শাহের দুই প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী। দীর্ঘকালের অবহেলিত নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজকে ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদ আকৃষ্ট করে। ফলে বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা কঠোরতর হয়। সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে অত্যন্ত কড়াকড়ি করা হয়।


শ্রীচৈতন্যদেব

বাংলার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। মুসলমান শাসকদের আমলে বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বিদেশে বাংলার রেশম ও কারুশিল্পের খ্যাতি ছিল। রৌপ্যমুদ্রা ও কড়ি দুইয়ের প্রচলন ছিল। সাধারণ মানুষ কড়ি দিয়েই কেনাবেচা করত। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ফার্সী ভাষার প্রচলন থাকলেও, সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। সমাজে কাজীর বিচার প্রচলিত ছিল। এই দুই বংশের আমলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। হোসেন শাহ বহু জনহিতকর কাজ করেন।

ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী বংশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রুকনুদ্দিন বরবক শাহ বাংলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিতেন। তিনি ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দান করেন। সুলতানদের উৎসাহ দানে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ হয়।



বড় সোনা মসজিদ (গৌড়)

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য রচিত হয়। শ্রীকর নন্দী অনূদিত বাংলা মহাভারত, শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর কাব্য বিখ্যাত। এই যুগে রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। এই যুগেই দেশে সমৃদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ইলিয়াস শাহী আমলের এবং বড় সোনা মসজিদ হোসেন শাহী আমলের স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দেয়। কদম রসুল ও শত গম্বুজ বিশেষ বিখ্যাত।

বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় এই যুগে সাধারণ বাঙালীর আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। দেশের লোক ছিল কৃষিজীবী। প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতো। দেশের বাইরে খাদ্যশস্য যেতনা। ফলে সাধারণ মানুষকে গ্রাসাচ্ছাদনের কথা চিন্তা করতে হতো না।

এই দুই বংশের শাসনকালে দেশের শ্রী-সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিল। ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের ফলে কুটীর শিল্পীরা অর্থলাভ করত।

দেশের শাসন ব্যবস্থার খরচ চলত সাধারণের দেওয়া রাজস্ব থেকে।

রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল জমির খাজনা ও বিশেষ কর। যে বৎসর শস্য ভাল হতো না সে বৎসর সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত থাকত না।

সবদিক বিচার করলে সুশাসন, ধর্মনৈতিক উদারতা ও সাহিত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে এই দুই বংশের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শাসনব্যবস্থা ঃ সুলতানী আমলে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দিল্লীর শাসনকর্তাগণ প্রত্যেক প্রদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। এই প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ দিল্লীর শাসনব্যবস্থার অনুকরণে প্রদেশের শাসন চালাতেন। এঁরা ছিলেন প্রদেশের সর্বময় কর্তা। প্রদেশের রাজস্ব থেকেই শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ হতো। এইসকল শাসনকর্তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্বের উদবৃত্ত অংশ দিল্লীতে পাঠানো। যুদ্ধের সময়ে তাঁদের দিল্লীর সুলতানকে সৈন্যসামন্ত দিয়েও সাহায্য করতে হতো।

প্রাদেশিক শাসনকর্তারা আবার অনেক সময়েই স্থানীয় উচ্চবংশীয়দের এক একটি অঞ্চলের শাসনভার দিতেন। কখনও রাজকার্যে নিয়োগ করতেন। এঁরা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্দিষ্ট কর দিতেন। যুদ্ধের সময় সামরিক সাহায্যও তাঁদের দিতে হতো। এগুলি ঠিক ঠিক পূরণ করতে পারলে এঁরা বংশপরম্পরায় নিজের অঞ্চলে প্রভুত্ব করতে পারতেন। দিল্লীর মত প্রদেশগুলিও সামরিক শক্তির উপরে নির্ভর করত। সৈন্যবাহিনীতে কোন জাতীয় ঐক্য ছিলনা। আফগান, তুর্কী, পারসিক, হিন্দু সব জাতি ও ধর্মের লোক সামরিকবাহিনীতে ছিলেন। দেশের বিচারব্যবস্থা ছিল কাজীর হাতে। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতেন কোতোয়াল। ভূমির খাজনা ও বিশেষ বিশেষ করই ছিল আয়ের উৎস। কিন্তু এই করের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা ছিলনা। ফলে জমিদাররা যথেচ্ছ কর আদায় করতেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের অবসান ও নবযুগের সূচনা

কনস্টান্টিনোপলের পতন ও তার প্রভাবঃ মধ্যযুগে গ্রীক দর্শন ও সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা এই শহর দখল করে নেয়। তুর্কী আক্রমণ শুরু হতেই কনস্টান্টিনোপলের পণ্ডিতসমাজ পুঁথিপত্র নিয়ে পশ্চিম ইতালির রোম ও তার নিকটবর্তী এলাকায় আশ্রয় নেন। ইতালি ছিল রোমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান পীঠস্থান। এই নূতন পণ্ডিতসমাজ আগমনের পর থেকে ইতালি প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য ও দর্শন পুনরুদ্ধার ও আলোচনার শ্রেষ্ঠ অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে রোম। ক্রমে এই জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপে নূতনভাবে এই জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার ইতিহাস রেনেশাঁস বা নবজাগরণ নামে খ্যাত।

রেনেশাঁস শুধুমাত্র অতীতের আলোচনা নয়, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নও তাতে নিহিত থাকে। মধ্যযুগে চার্চের ধর্মগুরুরা মানুষকে কঠোর জীবনযাপনের শিক্ষা দিয়েছিলেন ; কিন্তু প্রাচীন গ্রীক দর্শন মানুষকে বলেছে সুন্দরের উপাসনা করতে, জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে। ল্যাটিন ও গ্রীক দর্শন মানুষের উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলল। মানুষ আর চার্চের কঠোর বিধিনিয়ম মানতে চাইল না। অন্ধসংস্কারের চেয়ে যুক্তিবাদ মানুষের কাছে বড় হয়ে দাঁড়াল। সবকিছু সে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে চাইল।

ইতিমধ্যে **ক্যাক্সটন** নামে এক ইংরেজ মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করলেন (১৪৭৭ খ্রীঃ)। বইয়ের জন্য আর চার্চ বা বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করতে হয় না। সাধারণ মানুষও ছাপানো বই হাতে পেল। জার্মানির **জন গুটেনবার্গ** সীসার অক্ষর অর্থাৎ টাইপ তৈরী করে সেগুলি সাজিয়ে বই ছাপানোর কৌশল আবিষ্কার করেন। এতে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা দ্রুত বেড়ে যায়। ইউরোপের এই রেনেশাঁস কেবলমাত্র জ্ঞান চর্চাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে রেনেশাঁসের স্পর্শ লেগেছিল। ইতালি আগে

থেকেই পশ্চিম ইউরোপের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানের নূতন চিন্তা ও আলোচনা সেখানে আগেই শুরু হয়েছিল। কনস্টান্টিনোপলের পণ্ডিতগণের আগমনে সেই চিন্তা ও আলোচনায় জোয়ার এলো। ক্রমে তা জনসমাজে বিস্তৃত হয়ে তাদের মানসিক দিগন্তকে প্রসারিত করল।

রেনেশাঁস যুগের বৈশিষ্ট্যঃ এই যুগে যুক্তি ও বুদ্ধির চর্চার ফলে মানুষ বিনা বিচারে কিছু মেনে নিতে চাইল না। বুদ্ধির অতীত কোন জিনিষ মানুষ আর মেনে নিতে রাজি ছিল না। ফলে চার্চ ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে মানুষের ধারণায় ফাটল ধরল। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক প্রথা দ্রুত ভাঙতে লাগল ; মানুষ হয়ে উঠল ভয়



কলাম্বাস



কোপারনিকাস

ভীতি শূন্য। মানুষের এই নব চিন্তাধারায় নূতন ইন্ধন যোগাল নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার চার্চের মতবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করে দিলো। পোলাণ্ডের বৈজ্ঞানিক **কোপার নিকাস** প্রমাণ করলেন সূর্য স্থির, পৃথিবী নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করে ২৪ ঘণ্টায় আবর্তিত হচ্ছে। এবং এভাবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। চার্চের বিশ্বাস খণ্ডন করে বৈজ্ঞানিক **গ্যালিলিও** প্রচার করলেন সূর্যকে কেন্দ্র করেই গ্রহগুলি ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র

করে নয়। এইভাবে চার্চের প্রচার ভুল প্রমাণিত হওয়ায় চার্চ সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধা শিথিল হয়ে এলো। আবিষ্কৃত হলো কামান বারুদ। ফলে মধ্যযুগের সামরিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ল।

বার্থলোমিউ দিয়াজ আবিষ্কার (১৪৮৬ খ্রীঃ) করলেন আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল। **ভাস্কো ডা-গামা** জলপথে পৌঁছুলেন (১৪৯৮ খ্রীঃ) দক্ষিণ ভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। **কলম্বাস** আবিষ্কার করলেন (১৪৯২ খ্রীঃ) আমেরিকা। **ক্যাবট** নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড আবিষ্কার করলেন (১৪৯৭ খ্রীঃ)। পৃথিবীর আকার সম্পর্কে চার্চ এতদিন যা প্রচার করে আসছিলেন তা ভুল প্রমাণিত হলো।

ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে যুগান্তর আনলেন ইতালির **মাইকেল অ্যাঞ্জেলো** এবং **লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি**। **বোকাচিও** গদ্যরচনায় ও **পেত্রার্ক** কাব্য রচনায় নূতন দিক উন্মোচিত করলেন। মানুষের জীবনকে তাঁরা নূতন ভাবে দেখলেন। **ম্যাকিয়াভেলি** রাজনীতিবিদদের মনে আলোড়ন আনলেন। ইংল্যাণ্ডের চসার, ল্যাংল্যাণ্ড, জন ওয়াইক্লিফ প্রভৃতি সাহিত্যিক ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। এই সব সাহিত্যে চার্চের ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর শোনা গেল। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী **রাফায়েল** তাঁর চিত্রকলাতেও মধ্যযুগের ধ্যান ধারণার বিরোধিতা করলেন। রাফায়েলের চিন্তাধারা ইংরেজী কাব্যকেও প্রভাবিত করলো।

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে **সৃষ্টির** ক্ষেত্রে এই সকল নূতন দিক উন্মোচিত হওয়ায় ইউরোপের 'এক চার্চ এক রাষ্ট্র' এই ধর্মভিত্তিক আদর্শ ভেঙে পড়তে থাকল। জাতীয় চার্চ ও জাতীয় রাষ্ট্রের চিন্তাধারা মানুষের মনে জাগ্রত হলো। দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্যের চেতনা সারা ইউরোপে প্রসারিত হলো। নূতন নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নূতন দিগন্ত খুলে গেল। বিভিন্ন দেশ বাণিজ্যের সূত্রে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য গঠনে সচেষ্ট হয়ে উঠলো। এই নবজাগরণের ধারা জার্মানিতে গবেষণামূলক চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। হিব্রুভাষা ও সাহিত্যের পুনরুদ্ধার করা হয়। জার্মানির **মার্টিন লুথার** চার্চের কুসংস্কার ও

প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের ঢেউ ইউরোপের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এই ভাবেই রেনেশাঁস ইউরোপের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মাদর্শ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ওলটপালট করে দিয়ে এক নবযুগের সূত্রপাত করলো।

জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঃ

ইংল্যাণ্ড ঃ ইংল্যাণ্ডের অভিজাত শ্রেণী ফরাসী ভাষায় কথা বলা আভিজাত্যের অঙ্গ বলে মনে করতেন। ফ্রান্সের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী (১৩৩৭—১৪৫৩ খ্রীঃ) যুদ্ধের ফলে ফরাসীদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাদের ভাষা তাঁরা ত্যাগ করলেন এবং ইংরেজী ভাষা ব্যবহার শুরু করলেন। এইভাবে ইংল্যাণ্ডে ভাষাগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলো। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরই শুরু হলো ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাশায়ার রাজ পরিবারের মধ্যে সিংহাসনের দাবি নিয়ে গৃহযুদ্ধ। তিরিশ বছর ব্যাপী (১৪৫৫—১৪৮৫ খ্রীঃ) এই যুদ্ধ **দুই গোলাপের যুদ্ধ** নামে বিখ্যাত। বসওয়ার্থের যুদ্ধে এই রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এর ফলে ইংল্যাণ্ডের সামন্তশক্তির পতন হয়। টিউডর নামে এক নূতন রাজবংশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেশে চার্চের আধিপত্য বিনষ্ট হয়। প্রথম দিকে পার্লামেন্টের ক্ষমতা কিছুটা কমলেও পরে তা জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

ফ্রান্স ঃ রেনেশাঁস বা নবজাগরণের ফলে ফ্রান্সেও জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে কখনও ইংল্যাণ্ড জিতছিল কখনও ফ্রান্স। শেষ পর্যন্ত জোয়ান অফ আর্ক নামে এক কৃষক কন্যার নেতৃত্বে ফরাসী বাহিনী ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করে রাজধানী প্যারিস পুনরুদ্ধার করে।

পর্তুগাল ঃ পর্তুগালের অধিবাসীরা সমুদ্র পথে নানা দেশ আবিষ্কার করে ইউরোপে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে স্পেন পর্তুগাল দখল করে। ষাঠ বছর পরাধীন থাকার পর পর্তুগাল পুনরায় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। পর্তুগালের জাতীয়তা বোধের জাগরণের ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

হল্যাণ্ড—ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই ছোট দেশটির অধিবাসীদের বলা হয় **ডাচ**। আমাদের দেশে তাদের বলে **ওলন্দাজ**। এরা পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ব্যবসা করত। এদেশেও জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটে। রাজনৈতিক প্রাধান্য, বাণিজ্যিক স্বার্থ ও ধর্মীয় পার্থক্য নিয়ে তাদের সঙ্গে ইংরেজদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। বহু বিপর্যয় পার হয়ে হল্যাণ্ড স্বাধীনতা রক্ষা করে।

স্পেন—স্পেনও সমুদ্রপথে বহু দেশ আবিষ্কার করেছিল। আমেরিকা আবিষ্কারক কলম্বাস স্পেনের অধিবাসী। সমুদ্রপথে দূরদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যেও স্পেন উন্নতি করে। পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে স্পেনীয়রা মুসলমানদের হাত থেকে গ্রানাডা নিয়ে নেয় এবং একচ্ছত্র রাজশক্তির অধিকারী হয়। স্পেনেও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। স্পেনের ঘোষণা করেন অন্য ধর্মাবলম্বীদের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে নইলে স্পেন ছাড়তে হবে।

ইতিমধ্যে স্পেন ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং এক অপরাজেয় নৌবহর গড়ে তোলে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবসায়িক সার্থে ইংল্যাণ্ডের ও স্পেনের যুদ্ধ শুরু হয় এবং স্পেনের নৌবহর বিধ্বস্ত হয়। এই ঘটনা থেকেই ইংল্যাণ্ডে নবযুগের সূচনা ও স্পেনে দুর্দিনের শুরু হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইউরোপের উপনিবেশ ঃ মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন। প্রথম দিকে পর্তুগালই সবচেয়ে বেশী উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আফ্রিকা ও ভারতবর্ষেই তাদের উল্লেখযোগ্য উপনিবেশ ছিল। কিন্তু রাজশক্তির বিশেষ উৎসাহ ছিল না বলে এই প্রাধান্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ব্যবসা বাণিজ্যেই পতুর্গীজদের উৎসাহ ছিল বেশী। তারা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়।

উপনিবেশ স্থাপনে পরবর্তী শক্তি ছিল স্পেন। তারা আমেরিকায় উপনিবেশ গড়ে তুলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। কিন্তু শীঘ্রই অন্যান্য দেশ গিয়ে স্পেনের একচেটিয়া আধিপত্য নষ্ট করে দেয়।

অপরদিকে ওলন্দাজরাও অল্পবিস্তর উপনিবেশ গড়ে তোলে। এবং এরা উপনিবেশ অপেক্ষা ব্যবসাকেই গুরুত্ব দিত বেশী। তাই ওলন্দাজরা বিশেষ উপনিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি।

ফরাসীরা ব্যবসা বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন দুই ব্যাপারেই সমান উৎসাহী ছিল। উত্তর আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তারা উপনিবেশ স্থাপন করে। ষোড়শ শতকের প্রথম থেকেই ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স উভয় দেশের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে দুদেশই সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হয়। ফলে উত্তর আমেরিকা ও ভারত উভয় দেশেই এই দুই শক্তির মধ্যে বিরোধ বাধে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই জয়ী হয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা ভারতে বৃটিশ শাসনের সূচনা করে। ভারত আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাল। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে ভারতবাসীর কাছেও এক নূতন দিগন্ত খুলে গেল।

এইভাবে মধ্যযুগের অবসান হয়ে মানব-ইতিহাস আধুনিক যুগের দিকে পা ফেলল। কিন্তু সেই আধুনিক যুগ খুব সহজে আসতে পারে নি। পুরাতনের সঙ্গে তার বহু সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে নূতনের—জন্ম হয়েছে ইতিহাসের পাতায় আর একটি যুগের।

প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ ঃ

ইংরেজ বিদ্রোহ ঃ মধ্যযুগের সামন্ত শ্রেণী ক্ষমতার লোভে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে ওঠে। ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পুনরায় রাজশক্তি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের অপর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছিল চার্চ। এই চার্চের সঙ্গে ক্ষমতা ও আধিপত্য নিয়ে রাজশক্তির সংঘর্ষ শুরু হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই ক্ষমতার লড়াই চলে। অবশেষে রাজশক্তি জয়ী হয়।

মধ্যযুগের শেষ সীমায় বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের স্পর্শে মানুষের জীবন ধারায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা যায়। দেশে দেশে জাতীয়তাবাদের জন্ম হলো। সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হলো। রাজশক্তির প্রাধান্য ক্ষীণ হয়ে

এলো। দেশ শাসনে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা বাড়ল। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই পার্লামেণ্টের সভ্য। বিভিন্ন অধিকারের প্রশ্নে রাজার সঙ্গে প্রজাশক্তির সংঘর্ষ বাধে। মধ্যযুগে শাসকশক্তি মনে করতেন তাঁরা ঈশ্বর প্রেরিত। সুতরাং তাঁরা যা করবেন তাই ঠিক। কিন্তু বুদ্ধি ও যুক্তির চেতনায় বলীয়ান মানুষ আর তা মানতে রাজী হলো না। সাধারণ মানুষ আর তা মানতে রাজী হলো না। সাধারণ মানুষ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হলো। এজন্য তারা পার্লামেণ্টকে শক্ত ঘাঁটি রূপে গড়ে তুলতে চাইল। নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই রাজতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারিতা দূর করার একমাত্র পথ ছিল। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জনের আমলে ইংল্যাণ্ডে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেখা গেল রাজা খুশিমত কর আদায় করছেন, যুদ্ধ বিগ্রহ করছেন—পার্লামেণ্টের অনুমতি বা পরামর্শ নেওয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করছেন না। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে এইসব কারণেই রাজা প্রথম জেমসের সঙ্গে দেশবাসীর বারবার বিরোধ বাধে। পরবর্তী রাজা চার্লস এর আমলে এই বিরোধ চরমে ওঠে। ন'বছর ধরে দীর্ঘ সংঘর্ষের পর রাজশক্তি পরাজিত হয় ও চার্লসের (১৬৪৯ খ্রীঃ) মৃত্যুদণ্ড হয়। দ্বিতীয় জেমসের আমলে আবার বিরোধ চরমে ওঠে। দ্বিতীয় জেমস পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যান। এইভাবে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিনা রক্তপাতে প্রজাশক্তির জয় হয়। ইতিহাসে এ ঘটনা **গৌরবময় বিপ্লব** নামে খ্যাত। রাজার স্বেচ্ছাচারিতার অবসান হয়ে ইংল্যাণ্ডে প্রজাদের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও এর হাওয়া লেগেছিল। বহু বছর ধরে দেশে দেশে মানুষ সংগ্রাম চালিয়েছে। কোথাও সফল হয়েছে কোথাও হয়নি। তবু ইতিহাসে এই ঘটনার গুরুত্ব অপরিসীম। এই ঘটনাই মানব সভ্যতাকে মধ্যযুগ থেকে আর এক নতুন যুগে নিয়ে আসে। সে যুগ হলো আধুনিক যুগ। তোমরা পরের শ্রেণীগুলোয় সে সম্পর্কে পড়বে।

অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ইতিহাসে মধ্যযুগ

রচনামূখী প্রশ্ন ঃ

১। মধ্যযুগের সময়সীমা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। মধ্যযুগের জীবনধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। কিভাবে ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা হয়?

৪। মধ্যযুগ বলতে কি বোঝ? কিভাবে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

(ক) মধ্যযুগের ইউরোপে — স্থান ছিল অনেক উচ্চে। (খ) বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে — আরম্ভ ও অবসান হয়। (গ) গথগণ — আধিপত্য বিস্তার করে।

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ—

(ক) কত খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়? (খ) কার নাম অনুসারে কনস্টান্টিনোপলের নাম হয়? (গ) ক্রুসেড কতদিন চলেছিল?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মধ্যযুগে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য

রচনামুখী প্রশ্ন ঃ

১। জার্মান বর্বর জাতিদের পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে অভিযানের কাহিনী লেখ।

২। হূণদের নেতা কে ছিলেন? হূণদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। কিভাবে রোম অভিযানকারীরা মিশ্রজাতিতে পরিণত হয়?

৪। হূণদের রাজ্য কোথা থেকে কতদূর বিস্তৃত ছিল? তাদের রোমান সাম্রাজ্যে আগমন সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। ভিসিগথরা কিভাবে রোমান সাম্রাজ্যে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে তা বর্ণনা কর।

৬। রোমান আইন কিভাবে বর্বরদের মধ্যে টিকে রইল? প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ধারণা কিভাবে পরবর্তী রাজাদের প্রভাবিত করেছিল।

৭। বর্বর জার্মানদের সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে যা জান লেখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ভুল বক্তব্যগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ—(ক) হূণরা ছিল জার্মান বর্বর জাতির একটি শাখা। (খ) গাইসেরিক ছিলেন একজন হূণ দলনায়ক।

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ—

(ক) হূণজাতির শাখা দুটির নাম বল। (খ) কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব নাম কি ছিল? (গ) এলারিক কাদের নেতা ছিলেন? (ঘ) হূণরা কোথায় বাস করত? (ঙ) ভ্যাণ্ডালনেতার নাম কি ছিল? (চ) ভিসিগথরা কোন্ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে? (ছ) অস্ট্রোগথরা কোথায় বসবাস করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইউরোপের অন্ধকার যুগের কাহিনী

রচনামুখী প্রশ্ন ঃ

১। অন্ধকার যুগ কাকে বলে? কেন এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয়েছে?

২। অন্ধকার যুগে কারা শিক্ষাসংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিল?

৩। মধ্যযুগে সভ্যতা সৃষ্টিতে পাপপুণ্যবোধ কেমন গুরুত্ব পায় আলোচনা কর।

৪। মধ্যযুগে ইউরোপীয় সভ্যতার রক্ষা ও উন্নতির ক্ষেত্রে চার্চ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির অবদাস আলোচনা কর।

৫। মধ্যযুগে ইউরোপীয় সভ্যতা সৃষ্টিতে বর্বর জাতিসমূহের অবদান আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—অন্ধকার যুগে — ছিল বিদ্যাশিক্ষাকেন্দ্র। (খ) মধ্যযুগের শিক্ষার বিষয়বস্তুই ছিল — ও —। (গ) বিদ্যালয়ে সন্ন্যাসীরা — ভাষা শেখাতেন।

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

১। মধ্যযুগে বিদ্যাশিক্ষাকেন্দ্র ছিল কোথায় ?

২। মধ্যযুগে জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদান করতেন কারা ?

৩। এইসময় শিক্ষার বিষয়বস্তু কি ছিল ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাইজানটাইন সভ্যতা

রচনামুখী প্রশ্ন :

১। কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠাতা কে ? খ্রীষ্টধর্মে তাঁর অবদান আলোচনা কর।

২। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ? তাঁর চরিত্র আলোচনা কর।

৩। রোম সাম্রাজ্য পুনর্গঠনে জাস্টিনিয়ানের প্রচেষ্টার বিবরণ দাও।

৪। জাস্টিনিয়ানের আইন সংহিতা সংস্পর্কে আলোচনা কর।

৫। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের স্থাপত্য ও চিত্রকলা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের উৎকর্ষতা কি জান লিখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। শুদ্ধ বক্তব্যের পাশে √ ও অশুদ্ধ বক্তব্যের পাশে × চিহ্ন দাও :—

(ক) জাস্টিনিয়ান কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠাতা। (খ) 'কর্পাসজুরিস' জাস্টিনিয়ানের মহৎ কীর্তি। (গ) প্রাচীন বাইজানটাইন ছিল গ্রীক শহর। (ঘ) বেলিসেরিয়াস ছিলেন রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট।

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

১। গথদের কয়টি শাখা ? কি কি বল।

২। হূণরা কয়টি দলে বিভক্ত ছিল ?

৩। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কি ছিল ?

৪। এ্যাটিলাকে ইতিহাসে কি বলা হয়েছে ?

৫। সম্রাট কনস্টানটাইন কোন্ ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন ?

৬। শিল্প উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র কোথায় ছিল ?

৭। ভারতবর্ষ থেকে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে কি আমদানি করা হতো ?

৮। সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা কারা তৈরী করে ?

৯। কনস্টান্টিনোপল শহরের প্রতিষ্ঠা করেন কে এবং কেন ?

১০। বেলিসেরিয়াস কে ছিলেন ?

১১। কনস্টান্টিনোপল শহরে গুটিপোকার চাষ আরম্ভ হয় কিভাবে ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম ধর্মের প্রভাব

রচনামুখী প্রশ্ন ঃ

১। কোন শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে ? এই ধর্মের প্রবর্তক কে ? তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। আরব দেশ ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। প্রথম চার খলিফার যুগ কাকে বলে ? এই চার খলিফা সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। সংস্কৃতি বিস্তারে আরবদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। সভ্যতা সংস্কৃতিতে মুসলিম প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। টীকা লেখ ঃ—

আবু সিনা, আলবেরুনী, ইবন বতুতা, ইবন খলদুন, কোরআন।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। সঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ রেখে, ভুল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কেটে দাও—

(ক) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক — হজরত মোহাম্মদ / যীশুখ্রীষ্ট

(খ) যীশুখ্রীষ্টের জন্মভূমি — প্যালেষ্টাইন / মক্কা

(গ) ইসলাম ধর্মের নীতি সম্বলিত গ্রন্থ — কোরআন / বাইবেল
(ঘ) ইসলাম ধর্মের প্রথম খলিফা — হজরত ওমর / হজরত আবুবকর
(ঙ) স্পেনের আরবদের বলা হতো — মুর / বেদুইন

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

১। আরবের অধিবাসীরা কয়শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ও কি কি ?
২। হজরত মোহাম্মদের পিতামাতার নাম কি ?
৩। কারবালার প্রান্তরে কার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

রচনামুখী প্রশ্ন :

১। শার্লেমেন কে ছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে যা জান লেখ।
২। কোন ঘটনা থেকে শার্লেমেনের সাম্রাজ্য পবিত্র রোম সাম্রাজ্য আখ্যা পায় ? সেই ঘটনা সম্পর্কে যা জান লেখ।
৩। শার্লেমেনের শিল্প ও সাহিত্যানুরাগ সম্পর্কে আলোচনা কর।
৪। মধ্যযুগে খ্রীষ্টান মঠগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৫। টীকা লেখ—বেনিডিক্টিন সম্প্রদায়, স্কলাষ্টিকস,

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। সঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ রেখে, ভুল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কেটে দাও।
(ক) চিকিৎসাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল — প্যারিস / সেলের্ণো
(খ) সন্ন্যাসিনীদের মঠের অধ্যক্ষাকে বলা হতো — এ্যাবট / প্রায়রেস
(গ) পুরুষ সন্ন্যাসীদের বলা হতো — মঙ্ক্ / প্রায়র
(ঘ) ক্যাণ্টারবেরী টেলস্ রচনা করেন — দান্তে / চসার
(ঙ) শার্লেমেনের রাজধানী ছিল — অ্যাকেন / র‍্যাভেনা

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

১। কেণ্ট জেলের কৃষকদের কে ক্ষেপিয়ে তোলেন ?
২। মধ্যযুগে ধর্মশিক্ষার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল ?
৩। সাম্মা থিয়োলজিকা কার লেখা ?
৪। শার্লেমেন জাতিতে কি ছিলেন ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

রচনামুখী প্রশ্ন ঃ

১। সামন্ততন্ত্র কাকে বলে? মধ্যযুগে জমি নিয়ে মানুষে মানুষে কিভাবে চুক্তি হয়েছিল লেখ।

২। শিভালরি কাকে বলে? শিভালরি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। ম্যানর কাকে বলে? ম্যানর সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। সামন্তসমাজে কৃষকদের কয়টি শ্রেণী ছিল। তাদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) সামন্তপ্রথার তৃতীয় বা শেষ শ্রেণীর কৃষক হলো —। (খ) প্রধান সামন্তকে বলা হতো —। (গ) — ছিলেন ধনী জমিদার। (ঘ) সামন্ত প্রভুরা নিজ — প্রতিবেশী সামন্তের রাজপ্রাসাদে — জন্য পাঠাতেন। (ঙ) — কেণ্ট জেলের কৃষকদের ক্ষেপিয়ে তোলেন।

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ—

১। ডিউক কাদের বলা হতো? ২। ডিউকরা যাদের মধ্যে জমি বিলি করে দিতেন তাদের কি বলা হতো? ৩। ক্যানন ল' কারা তৈরী করেন। ৪। ক্রবেদররা কোন ভাষায় কাব্য রচনা করতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ ক্রুসেড

রচনামুখী প্রশ্ন ঃ

১। ক্রুসেড কি? কেন ক্রুসেড সংঘটিত হয়?

২। প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। সমাজ ও সংস্কৃতিতে ক্রুসেডের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—

(ক) রিচার্ড কে? (খ) সালাউদ্দিন কে ছিলেন?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ—

(ক) যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান জেরুজালেম শহর। (খ) পিটার ছিলেন একজন খ্রীষ্টান সম্রাট। (গ) সালাউদ্দিন ছিলেন একজন ধর্মযাজক। (ঘ) খ্রীষ্টান ধর্ম-গুরুকে বলা হয় সম্রাট।

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ—

১। যীশুখ্রীষ্টের কোথায় মৃত্যু হয়? ২। প্রথম ক্রুসেডে কে নেতৃত্ব দেন? ৩। কত খ্রীষ্টাব্দে ক্রুসেড শুরু হয়?

নবম পরিচ্ছেদ ঃ শহরের উৎপত্তি

রচনামুখী প্রশ্ন ঃ

১। মধ্যযুগে কিভাবে শহর গড়ে উঠল আলোচনা কর।

২। গিল্ড কাকে বলা হতো? মধ্যযুগের গিল্ড ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। মধ্যযুগের শহরের জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। বুর্জোয়া কথাটির কিভাবে জন্ম হলো সংক্ষেপে লেখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) মধ্যযুগে শিল্পব্যবসায়ীদের সংঘকে বলা হতো —।

(খ) মধ্যযুগে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাসস্থানকে বলা হতো —। আর সেখানকার অধিবাসীদের বলা হতো —।

(গ) সামন্তপ্রভুরা জমির শেষ সীমায় — বা — বসাতেন।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ মধ্যযুগে দূরপ্রাচ্য—চীন ও জাপান

রচনামুখী প্রশ্ন ঃ—

১। কে তাং বংশের প্রতিষ্ঠা করেন? কিভাবে তিনি চীনের ঐক্য সাধন করেন?

২। কোন সময়কে চীনের স্বর্ণযুগ বলে এবং কেন বলে? বিবরণ দাও।

৩। তাং যুগে চীনের উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। চীনে হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণের কি ফল হয়েছিল?

৫। সুং বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? এই বংশের কারা শাসন করেন? চীনের সংস্কারগুলির বর্ণনা দাও।

৬। সুং যুগের শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে যা জান লেখ।

৭। কুবলাই খান কোন দেশের বাসিন্দা? তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম কি এবং তাদের জীবনযাত্রার পরিচয় দাও।

৮। চীনে বৌদ্ধধর্মের কি প্রভাব পড়েছিল এবং কিভাবে?

৯। মার্কোপোলো সম্পর্কে যা জান লেখ এবং তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বল।

১০। জাপানে কখন মধ্যযুগ এসেছিল? এ যুগের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

১১। জাপানে কারা কিভাবে মধ্যযুগের বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটান?

১২। মধ্যযুগে চীন জাপান সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৩। সামুরাই কাদের বলা হতো? কাদের সঙ্গে এদের তুলনা চলে? এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। সঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ রেখে ভুল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কেটে দাও—

(ক) সুঙ বংশের প্রতিষ্ঠাতা	সুয়ান সুঙ / চাও কুয়াং ইন
(খ) চীনে ইউয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা	চেঙ্গিস খাঁ / কুবলাই খাঁ
(গ) পৃথিবীর প্রাচীনতম ছাপাগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে	তুন হুয়া গুহা / হাং চাউ শহর থেকে
(ঘ) তাং বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট	তাই সুঙ / কাও সু
(ঙ) মার্কোপোলো চীনভ্রমণ করেন	সুঙ আমলে / ইউয়ান আমলে

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) প্রাচীন কাল থেকে জাপানে — ধর্ম প্রচলিত ছিল। (খ) জাপানে সম্রাটদের বলা হয় —। (গ) জাপানের মধ্যযুগের শাসনকালকে বলা হয় — আমল। (ঘ) — অর্থ যোদ্ধার জীবনযাপন বিধি।

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

১। হিউয়েন সাঙ কোন দেশে গিয়েছিলেন ?

২। কোন চীন সম্রাটের পদবী ছিল মিং হুয়াং ?

৩। ইউলান নামে বিশ্বকোষ কোন চীনা পণ্ডিত প্রণয়ন করেন ?

৪। সেন স্থং কাকে মন্ত্রী করেন ?

৫। মার্কোপোলো কার আমলে চীনে আসেন ?

৬। চীনে কোন আমলকে 'কাব্যের স্বর্ণযুগ' বলা হয় ?

৭। চীনের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি কে ?

৮। তাং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ? ৯। চীনে ইউয়ান বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন ? ১০। মিং হুয়া অর্থ কি ? কাকে এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল ? ১১। জাপানে প্রচলিত প্রধান ধর্মের নাম কি ? ১২। জাপান শোগান আমলের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ মধ্যযুগে ভারতবর্ষ

রচনামুখী প্রশ্ন ঃ

১। ভারতে কখন হূণ আক্রমণ শুরু হয়। এর ফল কি হয়েছিল ?

২। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণকাহিনী থেকে ভারত সম্পর্কে যা জানা যায় সংক্ষেপে লেখ।

৩। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। পাল ও সেনবংশের সমাজজীবন, ধর্ম ও বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। বাতাপির চালুক্য ও কাঞ্চীর পল্লব বংশ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। সঠিক হলে √ চিহ্ন ও ভুল হলে × চিহ্ন দাও ঃ—

(ক) হূণজাতির নেতা ছিলেন তোরমান। (খ) হর্ষবর্ধন মৌখরী বংশের রাজা (গ) নালন্দার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গুপ্তসম্রাট বালাদিত্য। (ঘ) রামচরিত-মানস কাব্যের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী। (ঙ) বিখ্যাত স্থপতি ধীমান ও বীটপাল সেনযুগে জন্মগ্রহণ করেন।

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ—

১। বাণভট্ট কার সভাকবি ছিলেন ? তিনি কি কি কাব্য রচনা করেন ?

২। কোন্ বাঙালী হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণকালে নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। ৩। কোন কোন জাতির সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উৎপত্তি হয়? ৪। গীতগোবিন্দ কে রচনা করেন? ৫। দক্ষিণভারতে কোন্ বংশের নৌবাহিনী শক্তিশালী ছিল?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : ভারতের বৈদেশিক যোগাযোগ

রচনামুখী প্রশ্ন :

১। মধ্যভারতের সঙ্গে ভারতের কতখানি যোগাযোগ ছিল আলোচনা কর।

২। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাবের যে পরিচয় পাও তা সংক্ষেপে লেখ।

৩। তিব্বতে যিনি বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখ।

৪। সুবর্ণভূমি কাকে বলা হতো? এই অঞ্চলের বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পগুলির পরিচয় দাও।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

সঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছগুলি রেখে ভুল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কেটে দাও :

(ক) অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান শিক্ষাগ্রহণ করেন আচার্য শীলভদ্র / জ্ঞানভদ্রের কাছে।

(খ) তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন শীলভদ্র / অতীশ দীপঙ্কর

(গ) সহস্রগুহা চীনে / তিব্বতে অবস্থিত

(ঘ) বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর / শীলভদ্র

(ঙ) বেয়নের শিবমন্দির আঙ্কোরথমে / যবদ্বীপে অবস্থিত

(চ) সুমাত্রা দ্বীপকে বলা হতো সুবর্ণদ্বীপ / সুবর্ণভূমি

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

১। কে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন? ২। সুবর্ণদ্বীপ কাকে বলা হতো? ৩। বরবুদুরের বৌদ্ধস্তূপ কোথায় অবস্থিত? ৪। আঙ্কোরথম কার রাজধানী ছিল? ৫। খোটানের সংস্কৃত নাম কি ছিল?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ দিল্লীর সুলতানী আমল

রচনামুখী প্রশ্ন ঃ

১। কোন মুসলমান প্রথম ভারতে আসেন ? তুর্কীরা কিভাবে ও কি উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন ?

২। দিল্লীর সুলতানী আমলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিচয় দাও।

৩। ভক্তিবাদ কাকে বলে ? ভক্তিবাদ প্রচার করেন এমন কয়েকজন সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। বাংলার ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী আমলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। সুলতানী আমলের হিন্দুমুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

(ক) ভক্তিবাদী রামানুজ — শিক্ষাগ্রহণ করেন। (খ) চোল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —। (গ) মালবের রাজা — এবং গুপ্তসম্রাট বালাদিত্য — পরাজিত করেন। (ঘ) হিউয়েন সাঙের সময় নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন — নামে একজন —। (ঙ) পালযুগে বিক্রমশীল বিহারের আচার্য ছিলেন —।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ মধ্যযুগের অবসান ও নবযুগের সূচনা

রচনামুখী প্রশ্ন ঃ

১। রেনেশাঁস অর্থ কি ? রেনেশাঁস কাকে বলে আলোচনা কর।

২। ইউরোপে কোথায় প্রথম রেনেশাঁস শুরু হয় ? এই রেনেশাঁস শুরু হওয়ার কারণ কি ছিল ? কিভাবে সারা ইউরোপে রেনেশাঁস ছড়িয়ে পড়ে ?

৩। ব্যবসাবাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারে রেনেশাঁসের অবদান লেখ।

৪। ইউরোপে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তার কারণ ও পরিণতি আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

(ক) পোলাণ্ডের বৈজ্ঞানিক — প্রমাণ করেন সূর্য স্থির ও পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

(খ) — ছিল রোমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান।

(গ) আমেরিকা আবিষ্কার করেন—।

(ঘ) জার্মানির — চার্চের কুসংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু করেন।

(ঙ) — নামে এক ইংরেজ মুদ্রায়ন্ত্র আবিষ্কার করেন।

২। ভুল সাজানো আছে, ঠিক করে সাজাও—

(ক) মাইকেল অ্যাঞ্জেলো	চিত্রশিল্পী
(খ) লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি	ভাস্কর
(গ) ম্যাকিয়াভেলি	বৈজ্ঞানিক
(ঘ) গ্যালিলিও	রাজনীতিবিদ

মুখে মুখে উত্তর দাও—

১। সীসার অক্ষর কে আবিষ্কার করেন?

২। দক্ষিণভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ কে আবিষ্কার করেন?

৩। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কে ছিলেন?

৪। রাফায়েল কে ছিলেন?

৫। দুই গোলাপের যুদ্ধ কাদের মধ্যে কত বছর চলে?

সমাপ্ত